সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-কে

এই লেখকের কয়েকটি বই

উপন্যাস

অন্তর্ধান ● অবৈধ ● অনুসরণ ● স্বপ্নের ভিতর ● ঢেউ
সহযোদ্ধা ● সোনালী জীবন ● ঘরবাড়ি ● আড়াল
অহঙ্কার ● সবুজ গন্ধ ● একা ● উড়োচিঠি ● চরিত্র
বৃষ্টির পরে ● আমরা ● বিনিদ্র ● সন্ধিক্ষণ ● সম্পর্ক

কিশোর উপন্যাস

ইয়াসিন ইয়াসিন

গল্পগ্রন্থ

শ্রেষ্ঠ গল্প
মুখগুলি ● মূকাভিনয় ● শুক্রেশনি ● চিলেকোঠা
আলমের নিজের বাড়ি ● মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ
রুথ এবং অন্যান্য গল্প

কবিতা

শ্রেষ্ঠ কবিতা
নির্বাসিন, নয় নির্বাচন ● শব্দ চাই, দাও
কিছু স্মৃতি কিছু অপমান ● আহত অর্জুন
রাজার বাড়ি অনেক দূরে

সিনেমায় যেমন হয়

১

মার্চ মাসের এক বুধবার ভোরে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল গার্গীর। অদ্ভুত ঘোলাটে হয়ে আছে চারদিক, আলো ফুটলেও অস্বচ্ছতা কাটেনি, আশপাশের ঘরবাড়ি গাছপালা কেমন যেন থম মেরে আছে বিষণ্ণতায়। একটু খেয়াল করতেই বুঝল বৃষ্টিও পড়ছে, তবে থেমে থেমে, এক দু ফোঁটায়। এমন বৃষ্টি নৈঃশব্দ্যে চিড় ধরায় না এতোটুকু।

এই সময় সাধারণত পরিষ্কার থাকে আকাশ, ফুরফুরে হয়ে থাকে হাওয়া। বসন্তকালে যেমন হয়, বিশেষত ভোরে আর সন্ধের পরে দিব্যি অনুভব করা যায় চমৎকার সেই হাওয়ার স্পর্শ—তাদের এই দু দিক চাপা একতলার ভাড়া বাড়িতেও। শোবার ঘরের দুটি জানলার একটি দক্ষিণমুখো ; হাত চারেক দূরে আর একটা বাড়ির আড়াল থাকলেও ওই হাওয়া জানলা গলে প্রায়ই ঢুকে পড়ে ঘরে, পাখার হাওয়ার সঙ্গে মিশে স্বস্তি এনে দেয় ঘুমে। দিন দুয়েক ধরে অবশ্য গরম পড়তে শুরু করেছিল, কমে আসছিল হাওয়ার ফুরফুরে ভাবটা। তা বলে হঠাৎ এমন মেঘ করে আসবে, বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, কে ভেবেছিল !

অন্যদিন হলে ভোর-আকাশের এই ঘনঘটা দেখলে খুশি হতো গার্গী। এ সময় ঝেঁপে দু এক পশলা বৃষ্টি হলে গরমটা পিছিয়ে যেত, আরও কয়েকটা দিন কাটানো যেত স্বস্তিতে। বাস্তবিক এই একতলা বাড়ি, গরম আর মাঝেমধ্যে লোডশেডিং মিলিয়ে ভাবলে দীপ্র আর দীপঙ্করের জন্যে কষ্ট হয় তার। বিশেষ করে দীপঙ্করের জন্যে। মনে হয় নিজের জেদ বজায় রাখতে জোর করেই তার স্বামীকে আয়াসে অভ্যস্ত জীবন থেকে এই ক্লেশের জীবনে টেনে এনেছে সে। দীপ্র দীপঙ্করেরও ছেলে, ও-ও কি পারত না বাপের ভাগ্যের অংশীদার হতে ! তবে এই শেষের ভাবনাটাকে বিশেষ আমল দেয় না গার্গী। দীপ্র এখনো ছোট, এখন থেকেই যদি

অধিকাংশ মানুষের বাস্তবে অভ্যস্ত হতে শেখে তাহলে শরীরে মনে ক্রমশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠবে ও, ভবিষ্যতে যে-কোনো অবস্থার সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারবে নিজেকে।

আজ খুশি হলো না, বরং একটা আশঙ্কা ক্রমশ অধিকার করে নিল তাকে। পর পর ভাবল, এখন বৃষ্টি নামা মানে কমলার আসা অনিশ্চিত করা, কমলার না আসার অর্থ দীপ্রকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, ফিরিয়ে আনা এবং সে বা দীপঙ্কর যতোক্ষণ না বাড়ি ফেরে ততোক্ষণ পর্যন্ত ওকে আগলে রাখার ব্যাপারটা ভেস্তে দেওয়া। অথচ আজ তার অফিসে যাওয়া একান্ত জরুরি। ছেলের জ্বর, ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে বলে কাল তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল কমলা, তখনই ওকে আজকের কথা বলে রেখেছিল গার্গী। কমলা বলেছিল তাহলে একটু আগে আসবে। তার মানে সাতটার জায়গায় সাড়ে ছ'টায়। তার দেরি আছে এখনো।

তাহলে এখন থেকেই দুশ্চিন্তা করার কী মানে হয়!

এই মুহূর্তের উৎকণ্ঠা থেকে জোর করে বেরুবার চেষ্টায় নিজেরই হাসি পেল গার্গীর। ঘরপোড়া গরু। যতোই তাড়াবার চেষ্টা করুক, ফিরে ফিরে আসে আশঙ্কাগুলো। এখন যা ভাবছে, কে জানে কেন, কাল রাতে শুতে যাবার সময়েও একই ভাবনা ছেয়ে রেখেছিল মাথা। ঘুম হয়নি ভালো। এখন আলস্য টের পাচ্ছে।

দিনটা অন্যরকম হলেও চারদিকে ভোর হওয়ার পরিচিত শব্দগুলো ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। কলকাতার দূর দক্ষিণে এই জায়গাটায় শহর ঢুকে পড়লেও কিছু গাছগাছালি আছে এখনো, কিন্তু ক্বচিৎ শোনা যায় কাক ছাড়া অন্য কোনো পাখির ডাক। ভোরের শব্দ বলতে রিক্সার ভেঁপু, সাইকেলের ঘণ্টি। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ নিয়মিত হয়ে ধারাবাহিকতায় মিশে যাবার আগে এগুলোকে চেনা যায় আলাদা করে; সামনের রাস্তায় হঠাৎ-হঠাৎ হানা দিয়ে যায় ট্যাক্সি বা মোটর। বাড়িঅলা গোপাল নন্দী খালি পেটে কবরেজি ওষুধ খেয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরোন প্রতিদিন, কী ওষুধ কে জানে, তবে দোতলায় খলনুড়ি ঘাঁটার শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে গড়াগড়ি দেয় তাদের সিলিংয়ে। সিঁড়িতে শোনা যায় পায়ের

শব্দ, গোপালবাবু বেরুচ্ছেন, দরজার ল্যাচ বন্ধ হওয়ার শব্দ। এরপর আসবে ওঁদের ঠিকে ঝি টগরের মা, বেল দেবে সিঁড়ির দরজায়। ওখান থেকে কাজ সেরে তাদের দরজায় আসতে আসতে আরও আধঘণ্টা।

ল্যাচ বন্ধ হবার শব্দটা কানে নিয়ে বারান্দা থেকে শোবার ঘরে ফিরে এলো গার্গী। সে উঠে পড়ার পর বিছানায় বাড়তি জায়গা পেয়ে ব্যাঙের মতো থ্যাবড়ানো ভঙ্গিতে শুয়ে আছে দীপ্র। সাড়ে চার বছর বয়স হলেও ছেলেটা গায়ে বাড়েনি তেমন, ঘুমোলে আরও ছোট লাগে। এদিকে পাশ ফিরে দীপঙ্কর, ওর মৃদু নাক ডাকার শব্দ বুঝিয়ে দেয় সহজে উঠবে না। পাখা চলছে ফুল স্পীডে। আগে খেয়াল করেনি, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে এখনই সামান্য ঠাণ্ডা অনুভব করল গার্গী। হয়তো ভিজে আবহাওয়ার জেরে। এমনও হতে পারে রাত থাকতেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি, জোরও ছিল। আচ্ছন্নতার মধ্যে সে নিজেও টের পায়নি।

এগিয়ে গিয়ে রেগুলেটর ঘুরিয়ে পাখার স্পীড কমিয়ে দিল গার্গী। ঠাণ্ডা এড়ানোর জন্যে ভেজিয়ে দিল দক্ষিণের জানলার কপাটদুটো। এরপর সে রান্নাঘরে ঢুকবে, চা করবে। রোজ যেমন করে, বসবার ঘরের জানলাগুলো খুলে ডাকবে দীপঙ্করকে।

প্রতিদিনের ব্যস্ততায় নিজেকে জড়াতে গিয়ে আবার অফিসের চিন্তা ফিরে এলো মাথায়।

গতকাল দুপুর থেকেই ছুটি চেয়েছিল কমলা। ওকে ছেড়ে দেবার জন্যে সে নিজেই যদি ডুব মারত অফিসে, তাহলে হয়তো আজকের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হতো না। জ্বর বা অন্য যে-কোনো অজুহাতে আরও একটা দিন কাটিয়ে দিতে পারত বাড়িতে বসে। এই ধরনের প্রয়োজন থাকে ভেবেই প্রাপ্য ছুটিগুলো জমিয়ে রাখে সে। সমস্যা হলো, কাল সে ভেবেছিল উল্টোদিক থেকে।

জরুরি কতকগুলো স্টেটমেন্ট তৈরি করে নোটসমেত কাল বিকেলের মধ্যে জমা দেবার কথা ছিল সেকশনের ম্যানেজার সোমেশ্বর রায়ের কাছে। ভেবেছিল কথামতো হয়ে যাবে কাজটা। কিন্তু বাধা পড়ল শেষ হবার মুখে। একটা ফাইল আটকে আছে অডিট সেকশনে। যিনি দিতে

পারবেন সেই অলক চক্রবর্তী তালাচাবি লাগিয়ে লাঞ্চের আগেই চলে গেছেন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসে। আজ আর ফিরবেন না।

গার্গীকে বিপর্যস্ত করে দেবার পক্ষে এই খবরটুকুই যথেষ্ট ছিল। সেকশন আলাদা আলাদা হলেও একই অফিসের কাজে বেশ কিছু বারোয়ারী ব্যাপার থাকে, এটা ওটা চেক করার জন্যে এ ডিপার্টমেন্ট থেকে ও ডিপার্টমেন্টে ঘোরাফেরা করে ফাইল। এই অবস্থায় কী কারণে স্টেটমেন্টটা আজ শেষ পর্যন্ত তৈরি করা গেল না সোমেশ্বরকে তা বলতে পারত গুছিয়ে। সোমেশ্বর ক্ষুব্ধ হলে তার দায়িত্ব থাকত না। সেজন্যে নয়। গার্গী অস্বস্তিতে পড়েছিল নিজেকে নিয়েই। চারটে সওয়া চারটের মধ্যে তারও অফিস থেকে বাড়ি ফেরার কথা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত অনেকটা সময় বাড়ি থাকে না সে আর দীপঙ্কর, সেই সময়টায় দীপ্রকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনা, জামাকাপড় ছাড়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো এবং বিকেলে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে রেখেছে কমলাকে। দীপ্রর দেখাশোনা করা ছাড়া অল্পস্বল্প রান্নাবান্নাও করে। মাঝবয়েসী, বিশ্বাসী মেয়ে। গার্গী ওকে পুরো সময়ের জন্যেই রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ে সংসার থাকায় রাজি হয়নি কমলা। সাত পাঁচ ভেবে এই ফুরন ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিল সে। দীপ্রকে আগলানোর লোক না পেলে চাকরি ছেড়ে তাকে বসে থাকতে হতো বাড়িতে।

সেটা হয় না। গার্গী এখন টাকার মর্ম বোঝে। মাস গেলে হাজার দুয়েক আসবে নিজের হাতে, এই ভাবনায় অনেকটা আত্মবিশ্বাসী লাগে নিজেকে। জোর পায় হাঁটাচলায়।

আর একটা কারণও ছিল। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরায় পারিবারিক ব্যবসা থেকে সরে এসে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে দীপঙ্কর। ওই একই, সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং লাইনে, কনসালটেন্সির কাজে। সংসার খরচের অনেকটাই রোজগার করে আনলেও এখনো নিশ্চিন্তিতে পৌঁছুতে পারেনি। কম্পিটিশন বেড়েছে, আছে আরও নানা ঘাট, একার চেষ্টায় কল্কে পায় না। তখন হতাশা ও বিরক্তিতে ভোগে। মাঝে মাঝে গার্গীর

মনে হয়, দলের মধ্যে থেকে কাজ করলে ঠিক আছে, কিন্তু একার উদ্যমে এসব কাজে হয়ে উঠতে গেলে যে-ধরনের মানসিকতার দরকার, তা দীপঙ্করের নেই। ওকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ওর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় কি!

বাড়ি ফেরার তাড়া থাকায় যতো দ্রুত সম্ভব কাজটা শেষ করার চেষ্টা করেছিল গার্গী। লাঞ্চের জন্যে বরাদ্দ সময়েও নড়েনি টেবিল ছেড়ে। কিন্তু ফাইলটা না পাওয়ায় ঝামেলা বাড়ল, সেই সঙ্গে উদ্বেগও। কাজ সম্পূর্ণ হলো না, সে-কথা বলা যায় সোমেশ্বরকে, কিন্তু কী করে বলবে ছেলে আগলাতে তাকেও চলে যেতে হবে তাড়াতাড়ি? শুনে সোমেশ্বর মাথা নাড়বে হয়তো, গার্গী ভেবেছিল, কিন্তু এমনভাবে তাকাবে যার অর্থ অফিসটাকে আড্ডাখানা করে তুলেছে এরা, কাজ না করার জন্যে একটা না একটা অজুহাত লেগেই আছে।

সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে মরিয়া হয়ে সোমেশ্বরের ঘরে ঢুকল গার্গী। বলল, 'আমি যদি আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে যাই, কোনো অসুবিধে—'

আগে থেকেই গম্ভীর হয়ে ছিল সোমেশ্বর। গার্গীর কথা শুনে আড়ে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। বলল, 'থেকেই বা করবেন কি, আমার কাজ এগোবে না। চলে যান।'

কথাগুলোয় অপমান আছে কি না ভাববার জন্যে সামান্য সময় নিল গার্গী এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, খানিক ক্ষোভ প্রকাশ করলেও সোমেশ্বর তাকে অন্য কোনো ছুতোয় আটকাতে চায়নি। কাজের দায় শেষ পর্যন্ত সোমেশ্বরেরই. একত্রিশ মার্চ ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হবার আগে ম্যানেজমেন্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হবে ওকে। দু-তিন দিন ধরে তাড়া দিচ্ছিল, আজও ঠেকে যাওয়ায় হতাশ হওয়া আশ্চর্যের নয়। তখন বলল, 'কাল আর্লি আসবো, মিস্টার চক্রবর্তীর কাছ থেকে ফাইল নিয়ে দশটার মধ্যে সব পেপারস রেডি করে দেবো আপনাকে।'

'দেখুন পারেন কি না।' সোমেশ্বর উৎসাহ দেখালো না। বলল, 'আপনি আর্লি এলেও মিস্টার চক্রবর্তী যে ঠিক সময়ে আসবেন তার ঠিক

কি ! ওঁরও ঝামেলা চলছে। যাক গে, আপনার তাড়া আছে, আপনি যান।'

ফ্রী স্কুল স্ট্রিটের যে-জায়গায় তার অফিস, সেখান থেকে যাতায়াতের ট্র্যান্সপোর্ট পাওয়া সহজ নয় ; হয় যেতে হবে চৌরঙ্গিতে না হয় লোয়ার সার্কুলার রোডে। দু'দিকেই দূরত্ব প্রায় সমান, দ্রুত হাঁটলেও আট দশ মিনিট লাগে। বিকেলের এই সময়টায় ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না চট করে। তা ছাড়া, ট্যাক্সির যা ভাড়া, যাদবপুর পেরিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যেতে কুড়ি-বাইশ টাকা লাগবে। হুটহাট এমন খরচ করতে বড্ড গায়ে লাগে। ভাগ্য ভালো, লোয়ার সার্কুলার রোডে পৌঁছে একটা মিনিবাস পেয়ে গেল। ওই দিকেই যাচ্ছে। তাহলেও দেরি হয়েছিল। কমলার মুখ ভার। দরকারে ছেলের ওষুধ কেনার জন্যে ওর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে আজকের প্রয়োজনের কথাটা বুঝিয়ে বলেছিল গার্গী। কমলা চলে যাবার পর ভাবল, সে অজুহাতের কথা ভাবতে পারলে কমলা ভাববে না কেন ! ছেলের জ্বরের কথাটা সত্যি হলে জ্বর বাড়তেও পারে, তাকে ফেলে কি কমলা গার্গীর ছেলের দায় মেটাতে আসবে !

রান্নাঘরের সরু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পুরোপুরি অন্যমনস্কতার মধ্যে গতকালের ঘটনায় ফিরে গিয়েছিল গার্গী। দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হবে তিন-চার মিনিট নয়, একইভাবে পার করে দিয়েছে তিন-চার ঘণ্টা ; এর মধ্যে অস্বচ্ছ ভাব কাটিয়ে সামান্য ঔজ্জ্বল্য ফুটেছে আলোয়, তা পর্যন্ত লক্ষ করেনি। হঠাৎ সদর দরজায় বেল পড়তে সচকিত হলো।

এতো সকালে কে হতে পারে ! টগরের মা হলে নিশ্চিত দোতলার সিঁড়ির দরজায় বেল দিত। ওপরের বেলের শব্দ তাদের একতলাতেও শোনা যায় স্পষ্ট, তবে তফাত আছে দুটি শব্দের মধ্যে। তফাতটা চিনতে চিনতে এখন শুধু সে বা দীপঙ্কর নয়, দীপ্রও আলাদা করতে পারে। তাহলে কি কমলা ? তাড়াতাড়ি আসতে বলেছিল, তাড়াতাড়িই এসেছে ! নাকি অন্যমনস্কতাই তাকে এ-রকম শোনালো ! গার্গী ঠিক বুঝতে পারল না।

এ পাড়ায় তারা এসেছিল শীতের গোড়ায়। এই চার পাঁচ মাসে প্রতিবেশীদের কারও কারও সঙ্গে মুখচেনা হলেও প্রত্যক্ষ পরিচয় বলতে যা বোঝায় তেমন কারও সঙ্গেই হয়নি ; কেউ যেচে আসবে, আলাপ করবে তেমন সুযোগও ঘটেনি। স্বামী-স্ত্রী তারা দু'জনেই ব্যস্ত, বেশিরভাগ সময়েই বাড়িতে থাকে না। এ-রকম অবস্থায় যা হয়, ঠিকঠাক প্রতিবেশী হয়ে ওঠার উপলক্ষও পায় না। তার ওপর দীপঙ্কর স্বভাবে অমিশুকে। বরাবর বালিগঞ্জের বনেদি পাড়ায় থেকে একটা নাক-উঁচু ভাব এসে গেছে মনে, শহরতলিতে এই বাধ্যতামূলক নির্বাসন মেনে নিতে পারেনি কখনো। অঞ্চলটাকে 'মিডল ক্লাস স্লাম' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না ও, সেই জন্যে নিজে থেকে কারও সঙ্গে আলাপের গরজ দেখায়নি কোনো দিন। বাড়িঅলা গোপালবাবুর স্ত্রী সুরমা আলাপী মানুষ, ওঁর কাছে মাঝে মধ্যে গেছে গার্গী, মাসান্তে বাড়ি ভাড়াটাও সে-ই দিয়ে আসে। পাড়ায় আলাপ বলতে এইটুকু। তাদের তুলনায় দীপ্র বরং তার বয়েসী ছেলেমেয়েদের কাউকে কাউকে চেনে, পার্কে বেড়াতে গিয়ে কার কার সঙ্গে দেখা হয়, কে কোন বাড়িতে থাকে, কাদের গাড়ি আছে না আছে সেসব গল্পও করে। এই অবস্থায় পাড়ার কেউ এসে কোনো কারণে দরজায় বেল দেবে মনে হয় না, প্রয়োজনটাই বা কি ! দীপঙ্করের আত্মীয়-স্বজনরা ও বাড়ির ছায়া মাড়ায় না, তার নিজের মা-বাবারা থাকেন পার্ক সার্কাসে। এ বাড়িতে কে কতো বার এসেছে তা হাতে গোনা যায়।

তাহলে কে আসবে !

ভুল করে কেউ বেল দিয়েছে কি না দেখবার জন্যে আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল গার্গী এবং আবারও শুনল শব্দটা, স্পষ্ট, তাদেরই দরজায়।

দ্রুত বসবার ঘরের দিকে হেঁটে গেল গার্গী। এতোক্ষণের অন্যমনস্কতার মধ্যে জানলা দুটো খোলা হয়নি, ছোপ ছোপ অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে আছে ঘরের আসবাব। দরজায় গিয়ে ম্যাজিক আইয়ের ভিতর দিয়ে চোখ গলিয়ে দেখতে পেল না কাউকে। তখন ব্যস্ত হাতে ছিটকিনি এবং খিল দুটোই খুলে এক দিকের কপাট হাট করে তাকাল বাইরে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথই। গোড়ার অবিশ্বাস

কাটিয়ে চোখে পড়ল গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড় করানো ওর কালো অ্যামবাসাডর।

আগন্তুককে চিনতে পারলেও সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দ হতে পারল না গার্গী। বরং নতুন একটা ভাবনায় আড়ষ্টতা এসে গেল শরীরে।

ইন্দ্রনাথ এগিয়ে এলো। পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট, পায়ে স্ট্র্যাপ জুতো। ঠিক সকালের পোশাক নয়।

'ঘুম ভাঙালাম নাকি?'

'না, না। আসুন।' নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল গার্গী। দরজার অন্য কপাটটাও খুলে সরে এলো ঘরের মধ্যে। তারপর ব্যস্তভাবে জানালাদুটো খুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইন্দ্রদা, কোনো খারাপ খবর নয় তো? মা বাবা কেমন আছে?'

'ভালো। সবাই ভালো আছে।' ততোক্ষণে ঘরের ভিতর ঢুকে এসেছে ইন্দ্র, আঙুলে জড়ানো গাড়ির চাবির রিংটা অভ্যাসবশত ডানদিকে বাঁদিকে চক্রাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'হঠাৎ খারাপ খবরের কথা মনে হলো কেন!'

'এতো সকালে তো কেউ আসে না। তাই—', কথাটা ঘুরিয়ে নিল গার্গী, 'দরজা খুলতে দেরি হলো। আগেও একবার বেল দিয়েছিলেন, তাই না? আমি চা করছিলাম—'

'দ্যাখো, তাহলে সময় বুঝেই এসেছি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হলো এক কাপ চা খেয়ে যাই। অনেকদিন দেখাও হয় না।'

গার্গী ইন্দ্রকে দেখছিল। সহজ ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেও একটা ক্লান্তির ভাব ফুটেছে মুখে। মাঝারি গড়নের স্বাস্থ্যবান পুরুষ, রঙ পরিষ্কার, মাথার চুল ঘন ও ঈষৎ কোঁকড়ানো, জুলপি ও কানের পাশে পাক ধরেছে সামান্য— সাধারণভাবে ইন্দ্রর কপাল, নাক, ঠোঁট ও চিবুকের গড়নে এমন এক ধরনের সামঞ্জস্য আছে যাতে ওকে প্রায় সব সময়েই আত্মবিশ্বাসী দেখায়। কিছুটা সরলও। কথাবার্তাতেও ধরা পড়ে এই খোলামেলা ভাবটা। স্বভাব মেনে কথা বললেও আজ ওকে একটু অন্যরকম লাগছিল।

সম্ভবত একটু বেশিক্ষণই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে চোখ নামিয়ে নিল গার্গী এবং খেয়াল করল যতোটা সম্ভব ভব্য হয়ে থাকলেও এখনো সে রাতের পোশাকেই আছে, ব্রা পরেনি, চিরুনি দেয়নি চুলে। এটা ঠিক বাইরের লোকের সামনে বেরুনোর সাজ নয়।

ইন্দ্র বলল, 'তোমাকে চিন্তিত লাগছে ?'

'না। চিন্তিত হবো কেন !' শাড়ির আঁচলটা গায়ে পিঠে ভালো করে জড়িয়ে নিতে নিতে রাস্তার দিকে তাকাল গার্গী। চার চাকার গাড়িতে টাটকা সবজি তুলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে দুটো লোক। বড়ো রাস্তায় বাজারে গিয়ে বসবে। যেদিক থেকে এলো সেদিকে পিচের রাস্তা অনেকদূর এগিয়ে মিশে গেছে আশপাশের চাষের জমি, পুকুর, ও ফাঁকা মাঠ ঘেরা কাঁচা রাস্তায়। ওদিকটায় কিছু খাপড়ার চালের কাঁচা বাড়ি থাকলেও পুরোপুরি বসতি গড়ে ওঠেনি। এখানে আসার পর এক শীতের বিকেলে দীপ্রকে নিয়ে সে গিয়েছিল একদিন। ঠেলাটা পেরিয়ে যাবার পর ইন্দ্রর গাড়ির গা ঘেঁসে একটা সাইকেল রিক্সা চলে গেল। দুটি বাচ্চা নিয়ে মাথায় ঘোমটা টানা এক যুবতী। দেখল, গেট খুলে ঢুকছে টগরের মা। হাঁটার ধরনে ব্যস্ততা। সিঁড়ির দরজায় পৌঁছে প্রয়োজনের চেয়ে জোরে বেলে চাপ দিল।

গার্গী ভাবল, ইন্দ্র তাকে চিন্তিত দেখল কেন ! এটা ঠিক, কমলা এসেছে ভেবে দরজা খুলে ইন্দ্রকে দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। তাহলে কি তার চোখেমুখে হতাশাও ফুটেছিল, ব্যাপারটা ইন্দ্রর দৃষ্টি এড়ায়নি ! কিন্তু এমন হবে কেন ! বাস্তবে অনেকদিন পরে ইন্দ্রকে দেখে তার খুশিই হবার কথা। নিজের বৌদির দাদা, সম্পর্কটা খুব দূরের নয়, খুব কাছেরও নয়, নিতান্তই আত্মীয়তার। কিন্তু, গার্গী জানে, শুধু এইটুকু সম্পর্কের মধ্যেই ইন্দ্রকে ধরে রাখা যায় না।

জোর করেই এবার মুখে হাসি টেনে আনল গার্গী। ইন্দ্রকে বসতে বলে বলল, 'রহস্যটা ধরবার চেষ্টা করছিলাম। ইন্দ্রদা, এই সকালে ভবানীপুর থেকে হঠাৎ ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে আসতে যাবেন কেন !'

বেতের সোফায় বসতে বসতে ইন্দ্র বলল, 'তোমাদের গোবিন্দপুর

পেরিয়েও যাবার জায়গা আছে— । যাকগে, কর্তা কোথায় ? ওঠেনি এখনো ? ছেলে ?'

'সব উঠবে এবার । দীপঙ্করকে চা করে ডাকতে হয় ।' কথাগুলো বলবার সময়েই ধক্ করে গার্গীর মনে পড়ে গেল ইন্দ্রর স্ত্রী অশোকা মানসিক হাসপাতালে, জায়গাটা সোনারপুরের দিকে কোথায় যেন, সেখানেই গিয়েছিল নাকি ইন্দ্রনাথ ? আশ্চর্য ! নিজের বাবা-মা'র খবর নেবার আগে তার তো অশোকার খবর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল !

কুণ্ঠিত গলায় গার্গী জিজ্ঞেস করল, 'অশোকাদি কেমন আছেন, ইন্দ্রদা ? এখনো কি হাসপাতালে ?'

'হ্যাঁ, ওখানেই । কাল সন্ধে থেকে হঠাৎ খুব ডেসপারেট হয়ে গিয়েছিল, রাত্রে ওরা ফোন করে ডেকে পাঠাল । গিয়েছিলাম—'

ইন্দ্র আর এগোল না । গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওসব কথা পরে হবে । চা-টা দিয়ে ফেল এবার । দীপঙ্করকে ডাকো ।'

গার্গী আর দাঁড়াল না ।

অশোকার রোগটা পুরনো । গার্গী শুনেছে ছোটবেলা থেকেই মানসিকভাবে অসুস্থ ছিল ও । এমনিতে স্বাভাবিক ; বোধবুদ্ধিহীন নয়, লেখাপড়াতে ভালো, দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হবার সময় গার্গী যখন প্রথম দেখে অশোকাকে তখন সুন্দরীই মনে হয়েছিল । তবে স্বভাবে চাপা, কথা বলত না বিশেষ । পরে বৌদি শিখার কাছে শুনেছিল ছোটবেলার রোগ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেলেও হঠাৎ-হঠাৎ বিষণ্ণতা ও খামখেয়ালি ভাবটা কোনোদিনই কাটেনি, ব্রেনের নার্ভাস সিস্টেমে কী একটা গোলমাল থাকায় ডাক্তাররা বলেছিল যখন তখন এ রোগ ফিরে আসতে পারে । বিয়ের আগে এসব জানা যায়নি, দিল্লির মেয়েকে কলকাতায় এনে প্রায় লুকিয়েই বিয়ে দিয়েছিল অশোকার অভিভাবকরা । ক্রমশ জানাজানি হয় ব্যাপারটা । অদ্ভুত মানুষ ইন্দ্রনাথ । শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেও স্ত্রীকে অনাদর করেনি কখনো । চিকিৎসার জন্যে একবার বিদেশেও নিয়ে গিয়েছিল । কাজ হয়নি । গত পাঁচ-ছ' বছরে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে অশোকা । কখনো একটু ভালো থাকলে বাড়িতে

নিয়ে আসে ইন্দ্র, নার্স রেখে দেখাশোনা করে। বাড়াবাড়ি হলে আবার রেখে আসে হাসপাতালে। ইন্দ্রর ধৈর্য ও কর্তব্যবোধ দেখে দেখে মনে হয় নিজের দুর্ভাগ্যের আড়ালে কোথাও একটা পাঞ্জা লড়ার মতো ব্যাপারকে ধরে রেখেছে ও। হার মানেনি। বরং বঞ্চনা থেকে এমন এক স্থৈর্যময় শক্তি আহরণ করেছে যা অন্য কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

চটপট হাতে চা ভিজিয়ে কাপে ঢালবার আগে শোবার ঘরে গিয়ে দীপঙ্করকে ডেকে তুলল গার্গী। ইন্দ্রনাথ এসেছে, খবরটা দিল।

দীপঙ্কর বলল, 'কী ব্যাপার ! উনি হঠাৎ !'

'হঠাৎ কেন হবে !' গার্গী বলল, 'হাসপাতালে গিয়েছিলেন স্ত্রীকে দেখতে। ফেরার পথে। মনে হচ্ছে সারা রাত ওখানেই কাটিয়েছেন।'

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি, তার ওপর পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে বাথরুমে যেতে যেতে বলল, 'সকালে তোমাকে মনে পড়ল !'

কথায় ব্যঙ্গ স্পষ্ট। গার্গী ক্ষুণ্ণ হলো, কিন্তু জবাব দিল না। বহুদিন ধরেই দেখছে ইন্দ্রকে দীপঙ্কর ঠিক পছন্দ করতে পারে না, এমনকি ইন্দ্রর দুঃখময় জীবনের বৃত্তান্তও ওকে নরম করে না এতোটুকু। মাঝে মাঝে গার্গীর মনে হয়, তার বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রই প্রতিষ্ঠিত, সচ্ছল এবং উচ্চশিক্ষিত বলে মনে মনে ওকে ঈর্ষা করে দীপঙ্কর। ও জানে ইন্দ্র সম্পর্কে গার্গীও কিছুটা দুর্বল, সেজন্যেও হয়তো।

দীপ্র এখনো গাঢ় ঘুমে। সাধারণত সাতটার আগে ওঠে না ও। ইন্দ্র যদিও ছেলের খোঁজ করেছিল, গার্গী ভেবে দেখল, অসময়ে ঘুম ভাঙালে পরে ঘ্যান ঘ্যান করতে পারে। বরং ঘুমোক।

আলনা থেকে ব্রেসিয়ারটা টেনে নিয়ে, পরে, ব্লাউজের বোতাম এঁটে ব্যস্ত হাতে চুলটা সামান্য আঁচড়ে নিয়ে রান্নাঘরে গেল গার্গী। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বসবার ঘরের দিকে যাচ্ছে দীপঙ্কর, সেখান থেকেই দেখল সে, সকালে যেমন দেখেছিল তার চেয়ে এখন অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ, মেঘের মধ্যে থেকে কোথাও কোথাও উঁকি দিচ্ছে ধোঁয়াটে নীল। বৃষ্টি নেই। এসব দেখে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করল

গার্গী। ইন্দ্র চলে গেলে দীপ্রর স্কুলে যাবার জোগাড় করবে সে। তাড়াতাড়ি আসবে বললেও কমলা যে তাড়াতাড়ি আসবে তার ঠিক কি !

চা নিয়ে বসবার ঘরে এসে দেখল মুখোমুখি সোফায় বসে কথা বলছে দুজনে। কিছু ভেবে দীপঙ্করের কাপটাই আগে এগিয়ে দিল গার্গী, তারপর ইন্দ্রকে দিল, বিস্কুটের প্লেটটা নামিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে। দীপঙ্কর বসেছে লম্বা সোফাটায়, তার কোণের দিকে নিজেও গিয়ে বসল।

'তোমাদের এদিকটা বেশ।' চায়ে চুমুক দিয়ে ইন্দ্র বলল, 'দীপঙ্করবাবুকে বলছিলাম খাস কলকাতার সবকিছুই বড়ো ক্লান্তিকর, একঘেয়ে। এদিকে এলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সুবিধেমতো জমি পেলে কিনে রাখতে।'

'ভবানীপুর ঘিঞ্জিই।' দীপঙ্কর সিগারেট জ্বালাতে সময় নিল। তারপর বলল, 'আমাদের ওদিকটা তা নয়। তা ছাড়া শুধু খোলামেলা দেখলেই হবে না, এখানকার লোকজন কেমন সেটাও দেখতে হবে। বাড়িগুলো দেখবেন, কেউ কোনো প্ল্যান করে করেছে বলে মনে হয় না।'

'আপনার চোখ আলাদা। ছোটবেলা থেকেই বাড়ি করা দেখছেন, আপনি তা বলতে পারেন।' পরের কথাটা বলবার আগে ঘড়ি দেখল ইন্দ্র, চায়ের কাপে বড়ো করে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনার প্ল্যান তো আপনিই করবেন। সেটা খারাপ হবে কেন !'

গার্গী বুঝতে পারল ইন্দ্র ওঠবার জন্যে ব্যস্ত। দীপঙ্করের সঙ্গে আগে কতোটুকু কী কথা হয়েছে জানে না, কিন্তু এখন যা বলছে সবই দায়সারা, কথার পিঠে কথা সাজানো। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না দীপঙ্কর অশোকার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছে কি না। ইন্দ্র যে ধরনের মানুষ, নিজে থেকে ব্যক্তিগত কোনো প্রসঙ্গ তুলবে না।

জলটা একটু বেশিক্ষণ ধরেই ফুটেছিল, চায়ে চুমুক দিয়ে কড়া স্বাদ জিভে লাগায় অপ্রতিভ বোধ করল গার্গী। এখন মনে হচ্ছে ইন্দ্রর জন্যে নতুন করে জল ফোটাতে পারত। এখনও পারে, কতোক্ষণ আর সময় লাগবে ! কিন্তু কথাটা তুলতে পারল না। ভেবেচিন্তে বলল, 'ইন্দ্রদা, হাসপাতালে গিয়েছিলেন বললেন, অশোকাদি এখন কেমন আছেন

বললেন না তো !'

'পাগলের আর ভালো থাকা মন্দ থাকা আছে নাকি ! ডেসপারেসন কাটাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত মরফিন দিল। ওয়াচে রেখেছিল। ঘুমিয়ে থাকায় আমাকে চলে যেতে বলল।'

শেষের দিকে ভারী হয়ে এলো ইন্দ্রর গলার স্বর। দৃষ্টিতে ঔদাসীন্য। খানিক মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে, চলি আজ। বিকেলে দিল্লি যাবার কথা আছে— অবশ্য সব ঠিকঠাক চললে—'

ইন্দ্রর দেখাদেখি দীপঙ্করও উঠে দাঁড়িয়েছিল। গার্গী তাকাতে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বলল, 'এ দিকে এলে আসবেন আবার।'

'হ্যাঁ অবশ্যই।'

দরজা পর্যন্ত এসে ভিতরে ফিরে গেল দীপঙ্কর।

ব্যাপারটা পছন্দ হলো না গার্গীর। খালি পায়ে ইন্দ্রর পিছনে পিছনে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এলো সে।

'ইন্দ্রদা, এরকম তো আগেও হয়েছে। ভাববেন না বেশি। ঠিক হয়ে যাবেন।'

'কার কথা বলছ ? অশোকার ?' ইন্দ্রনাথ যেন নিজের মধ্যে ছিল না। পরে বলল, 'কেউ ভালো আছে, সুস্থ হয়ে উঠেছে শুনলে ভালো লাগে। অপ্রকৃতিস্থদের নিয়ে সমস্যা কি জানো, ওরা ভালো আছে না খারাপ সেটা কম্যুনিকেট করতে পারে না। যন্ত্রণাটা কোথায় বোঝাতে পারে না।'

ইন্দ্রর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা গার্গীকে চুপ করিয়ে রাখল। শুধু ভাবল, লোকটা সারারাত জেগে কাটিয়েছে, নিশ্চয়ই বিপর্যস্ত, তবু ফেরার রাস্তায় সরাসরি বাড়ি না গিয়ে এসেছিল তারই কাছে। শুধু এক কাপ চায়ের জন্যে ?

প্রশ্নটা দুলিয়ে দিল তাকে। এই মুহূর্তে তার ও ইন্দ্রর মধ্যে দূরত্ব এক হাতেরও কম, এই নৈকট্যে জোরে নিঃশ্বাস ফেললে শোনা যাবে। কিন্তু, গার্গীর মনে হলো, এটাই অনেকখানি, সে কিছু বলবার চেষ্টা করলেও শুনতে পাবে না ইন্দ্র।

গেটের কাছে পৌঁছে একবার আকাশের দিকে তাকাল ইন্দ্র। দৃষ্টিটা ওপরেই নিবদ্ধ রাখল কিছুক্ষণ। তারপর গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাথাটা যখন একেবারে কাজ করে না তখন প্রায়ই একটা কথা বলে অশোকা। বলে, সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে— সিনেমায় যেমন হয়। কেন বলে, কোন সিনেমার কথা বলে, কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না। বিয়ের পর যখন প্রথম বাড়াবাড়ি হলো, তখনই শুনেছিলাম। কালও বলছিল। ডাক্তাররাও ভেবে কূলকিনারা পাননি। তাঁদের ধারণা পারসেপসন লেভেলে কোনো ফিক্সেসন এসে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও শুধু নিজের কথা বলে না—'

'অদ্ভুত তো!'

'হ্যাঁ, অদ্ভুতই—।' ইন্দ্রনাথ হাসল। ক্লেশের হাসি, তবু স্বচ্ছতা আড়াল হলো না। গাড়ির দিকে এগিয়ে যাবার আগে বলল, 'চলি। তোমাদের বাড়িতে কিছু বলতে হবে?'

'বলবেন ভালো আছি। দু-চারদিনের মধ্যে যাবো।'

সেই সময় আকাশ ফুঁড়ে রোদ উঠল। মেঘভাঙা রোদ, উত্তাপ নেই, শুধু আলোটুকুই দেখা যায়।

গাড়ির দরজা খুলে তাকেই দেখছে ইন্দ্র।

'তুমি কি রোগা হয়েছ একটু? নাকি ইচ্ছে করেই স্লিম হচ্ছ?'

কী জবাব দেবে ভেবে অস্বস্তিতে পড়ল গার্গী। সময় নিয়ে বলল, 'কেউ বলেনি। আপনিই বললেন।'

'মনে হলো।'

'আমার কথা থাক, ইন্দ্রদা। আজ আপনাকে দেখে ভালো লাগল না। মনে হচ্ছে নিজেকে নিয়ে ভাবেন না।'

ইন্দ্র জবাব দিল না। ক'মুহূর্ত যাবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট নিয়ে ডান হাত বের করে নাড়ল একবার, তারপর দ্রুত উধাও হয়ে গেল!

তখনই গেট থেকে সরে এলো না গার্গী। পিচের রাস্তার পাশে ভিজে মাটিতে দাগ বসেছে গাড়ির চাকার, অন্যমনস্কভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে

থাকতে থাকতে জোরে নিঃশ্বাস পড়ল তার। ইন্দ্র যেদিকে গেল সেদিক থেকে সাইকেল ছুটিয়ে আসছে খবরের কাগজের হকার। এখানেই থামবে। ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে ফেরার সময় গার্গী দেখল ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন সুরমা। হয়তো অনেকক্ষণ ; এমনও হতে পারে তার ও ইন্দ্রর কথাবার্তার সবটুকুই শুনেছেন। শুনুন। চেনার জন্যে যেটুকু হাসি দরকার সেটুকুই হেসে ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল গার্গী। এবং ভাবল, আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কমলা দেরি করছে কেন!

দীপঙ্কর বারান্দায়। ওর হাতে কাগজটা দিয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকাল গার্গী।

'দীপ্র উঠেছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বাথরুমে। কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরতে ধরতে দেয়াল ঘেঁসা চেয়ারে বসে দীপঙ্কর বলল, 'লোকটাকে বুঝতে পারি না। একটা ইনসেন ওয়াইফকে ঘাড়ে নেবার কী দরকার ছিল! ঠিক সময়ে ডিভোর্স করে দিলেই পারত!'

'সবাই কি আর তোমার মতো!'

'তার মানে! আমি কী করলাম!'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাগুলো, গার্গী বুঝতে পারল এভাবে বলা উচিত হয়নি। নিজেকে সামলাবার জন্যে বলল, 'আমি সে-কথা বলিনি। ডিভোর্স করার কথাটা তুমি যতো সহজে ভাবলে, ইন্দ্রদা হয়তো তা ভাবতে পারেননি। মহিলাই বা যেতেন কোথায়?'

'কেন? বাপ মা'র কাছে! যারা জোচ্চুরি করে গছিয়েছিল! ভ্যালিড রিজন ছিল!'

গার্গী স্বামীকে দেখল। চোখ কাগজে। কথা বাড়াতে ইচ্ছে করছিল না তার। দীপ্রর খোঁজে যেতে যেতে সে শুধু বলল, 'কার মন কী ভাবে কে বলবে!'

২

কমলা এলো না।

ন'টার মধ্যে অফিসে বেরোয় গার্গী। রোজ একই সময়ে না হলেও মোটামুটি ওটা দীপঙ্করেরও বেরুবার সময়। দীপ্রর স্কুল সাড়ে ন'টায়। এখান থেকে খুব দূরে নয়, সুতরাং ধীরেসুস্থে পৌঁছে দিতে পারে কমলা—কখনো রিক্সায়, কখনো মিনিবাসে, কখনো বা বাসে, যখন যেমন পায়। ও আসবে কি আসবে না নিয়ে ভোর থেকেই শঙ্কায় ছিল, তবু জিইয়ে রেখেছিল আশাটা। সাড়ে আটটাও বেজে যাচ্ছে দেখে চিন্তায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এলো গার্গীর। নার্সারিতে পড়ে, এক দিন স্কুল কামাই করলে কিছু হবে না ; কিন্তু বাড়িতেই বা ওকে আগলাবে কে ! ছেলেকে পিঠে বেঁধে তো অফিসে যাওয়া যায় না !

দীপঙ্করের বেরুবার তাড়া আছে, আগেই তা বলে রেখেছিল। সকালে গার্গীর উদ্বেগে আমল দেয়নি তেমন। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেছে দেখে দাড়ি কামাতে কামাতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে ?'

গালে চোয়াল এঁটে দীপঙ্করের ব্রেকফাস্ট রেডি করছিল গার্গী। জবাব দিল না।

'আজ না হয় অফিসে না গেলে !'

'আজ কামাই করলে চাকরি যাবে।' অস্বস্তি মেশানো গলায় গার্গী বলল, 'আমি তো আর তোমার মতো নিজেই নিজের বস নই !'

দীপঙ্কর বুঝতে পারল স্ত্রীর মেজাজ খারাপ। কিন্তু এই কথাগুলোই কেন বলল তা বুঝতে না পেরে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'চাকরি যাবে মানে !'

'কাল একটা কাজ ইনকমপ্লিট রেখে চলে এসেছি। আজ তাড়াতাড়ি

গিয়ে সেটা শেষ না করলে ক্ষতি হবে। কাজটা জরুরি।'

'বাব্বা! তুমি তো অফিসে বেশ ইমপর্ট্যান্ট লোক দেখছি!'

গার্গী জবাব দিচ্ছে না দেখে রেজরটা হাত বদল করে আবার বাথরুমে ফিরে গেল দীপঙ্কর।

কিন্তু কথাগুলো গেঁথে গেল। কাজে দু হাত জোড়া ; ঠোঁটে অল্প সিরসিরানি এবং চোখে জ্বালা অনুভব করে জোর করে নিজেকে এই মুহূর্তের প্রয়োজনে ফিরিয়ে আনল গার্গী। এটা ঝগড়া শুরু করার সময় নয়।

দীপ্রকে আগেই তৈরি করেছিল। এখন খাইয়ে দিলেই স্কুলে যেতে পারে। এই সময়টায় বড্ড নাকাল করে ছেলেটা। যে-কোনো ছুতোয় খেতে দেরি করে, এটা খেলে ওটা ছোঁয় না, এমন ভাব দেখায় যেন মুখে রোচে না কিছু। কমলা ওর ধাতটা বুঝে গেছে, নানা গল্পে ভুলিয়ে ঠিকঠাক বাগে এনে ফেলে। আজ তাকেই কমলার ভূমিকায় নামতে হবে ভেবে মনে মনে গুছিয়ে উঠছিল গার্গী, দীপঙ্করের শ্লেষ-মেশানো কথায় ছড়িয়ে গেল সব প্রস্তুতি

মনে হচ্ছে কথাগুলো শুধু বলবার জন্যেই বলেনি দীপঙ্কর, হঠাৎও বলেনি। সকালে ইন্দ্র আসার পর থেকেই গম্ভীর। তবে এখন সম্ভবত জের টানছে গত রবিবারের ঘটনার। ওর বাবা রঘুনাথের শরীরটা নাকি ভালো যাচ্ছে না কিছু দিন থেকে। রবিবার সকালে দীপঙ্কর বলেছিল দীপ্রকে নিয়ে গার্গী যেন একবার ঘুরে আসে ওদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি থেকে। গার্গী আপত্তি করেনি, তবে ও চেয়েছিল স্বামীও যাক সঙ্গে। দীপঙ্কর, যে-কোনো কারণেই হোক, রাজি হলো না। সেই থেকে টানাপোড়েন, শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটি।

দীপঙ্কর যেভাবে বলে, বলল, 'এটা তোমার নিজের বাবা-মা'র ব্যাপার হলে এর মধ্যে তিন বার ঘুরে আসতে।'

'আসতামই তো।' গার্গী বলল, 'তোমার বাবার ব্যাপারে তোমার কোনো গরজ নেই। আমার থাকবে কেন!'

'দ্যাখো, বাড়াবাড়ি কোরো না। নিজের জায়গা থেকে কথা বলো।'

'তাই বলছি। অফিস করতে হবে, রান্না করতে হবে, ছেলে সামলাতে হবে। এর পরে রবিবারটা যে একটু হাত-পা-ছড়াবো—'

'ও·কে, ও·কে। তোমার যাবার দরকার নেই।'

পায়ে চপ্পল গলিয়ে, সশব্দে দরজা টেনে বেরিয়ে গেল দীপঙ্কর।

গার্গী থেমে থাকেনি। দীপঙ্কর চলে যাবার পর শান্ত মেজাজে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে গার্গীর মনে পড়েছিল আজ রবিবার, দীপঙ্করের বোন তমসার ইউনিভার্সিটি নেই, সকালে আর কোথায় বেরুবে! ওকে একটা ফোন করে জানা যেতে পারে শ্বশুরমশায়ের কী হয়েছে, সত্যিই চিন্তার কিছু আছে কি না। তেমন বুঝলে যাবে, না হলে না—তাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এই ভেবে একটু পরে দীপ্রকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। বড়ো রাস্তার মুখে 'আরোগ্য মেডিক্যাল স্টোর্স'-এ টেলিফোন আছে, প্রয়োজনে ব্যবহার করে তারা। ওখান থেকে ফোন করল শ্বশুরবাড়িতে।

তমসাই ধরল। জিজ্ঞেস করতে বলল, 'তেমন কিছু নয়। ব্লাডপ্রেসার বেড়েছিল, একদিন অফিসে যাননি। এখন ঠিক হয়ে গেছে। কে বলল তোমাকে?'

'তোর দাদা।'

'বোধহয় অফিসে ফোন করেছিল, কেউ বলেছে। নিজেও তো একবার দেখে যেতে পারত!'

তমসার অনুযোগ এড়িয়ে গিয়ে গার্গী বলল, 'আমি ভাবছিলাম যাবো—'

'এমনি এলে এসো।' তমসা বলল, 'শুধু এইজন্যেই তাড়াহুড়ো করে আসতে হবে না।'

শেষ বাক্যটির অর্থ বোঝা কঠিন নয়। গার্গী নিজের জায়গা চেনে। তবে যেতে হবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। দুপুরে খেতে বসে তখনো দীপঙ্করকে গম্ভীর দেখে ততোধিক গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোমার বাবার ব্লাড প্রেসার বেড়েছিল। এখন ভালো আছেন। অফিসেও যাচ্ছেন।'

খাওয়া থামিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল দীপঙ্কর, কথা না বলে গুটিয়ে নিল নিজেকে। তার পর থেকে চুপচাপ হয়ে গেলেও সম্ভবত রাগটা পুষে রেখেছিল মনে, আজ ফেরত দিল। হতে পারে, অন্য কোনো কারণও থাকতে পারে।

কিন্তু , এই মুহূর্তের সমস্যা বুঝেও কি ও একটু রেহাই দিতে পারবে না গার্গীকে ! কেন বুঝছে না দীপঙ্কর, ইমপর্ট্যান্টি নয় বলেই আজ তার অফিস যাওয়া জরুরি ! অন্তত আজকের দিনটা যদি ও দীপ্রকে স্কুলে পৌঁছে দিতে এবং নিয়ে আসতে পারত !

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে আবার কথাটা তুলল দীপঙ্কর।

'তৈরি তো করলে ছেলেকে। এরপর কী করবে ?'

ভিতরে অসহায় বোধ করলেও গার্গী এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'তুমি পারবে না ?'

'কী ?'

'আজকের দিনটা ম্যানেজ করতে ? আমি না হয়—'

কথা শেষ করল না। গার্গীর মনে হলো যা বলতে চায় তা তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় এখনো।

'এসব দায় যদি আমাকে নিতে হয় তাহলেই গেছি।' রাগ থেকে নয়, বেশ চিন্তিত গলাতেই বলল দীপঙ্কর, 'আমার কাজটাও কম জরুরি নয়। সাড়ে ন'টার মধ্যে আর্কিটেক্টের কাছে যেতে হবে, সেখান থেকে—'

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল দীপঙ্কর।

কথার অভাবে গার্গীর দৃষ্টি এখন দীপঙ্করের ওপরেই নিবদ্ধ, খুঁটিয়ে দেখছে স্বামীকে। ওর রঙ ফর্সা, চেহারা লম্বা, কিন্তু মোটা নয়, চওড়া কপালের তুলনায় নাকের নীচে চিবুক পর্যন্ত অংশ সরু মনে হয়, চোখের মণির খয়েরি ভাবে প্রায়ই অসম্পূর্ণতা এসে যায় দৃষ্টিতে। চুল পাতলা হতে শুরু করেছে, চিরুনি চালালে দাঁড়ের টানে চাঁদির খাঁজ দেখা যায়। বিয়ের সময় বা তারও আগে যেমন ছিল তার চেয়ে বদলে গেছে অনেকটা। সত্যিই বদলে গেছে।

দেখতে দেখতেই নিঃশ্বাসের চাপ পড়ল বুকে।

মা ও বাবার এই কথোপকথনের স্তব্ধতায় কিছু আঁচ করল দীপ্র। হঠাৎ বলল, 'আমি আজ স্কুলে যাবো না।'

'তা যাবে কেন!' গার্গী বলল 'আমার অসুবিধে বাড়াতে তোমাকেও কিছু করতে হবে তো!'

'না। যাবো না।'

'দীপ্র, একদম বায়না করবে না। তাহলে একা ফেলে যাবো।'

'ওকে ধমক দিয়ে লাভ কি!' চিরুনি রাখতে ঘরে গিয়েছিল দীপঙ্কর, ফিরে এসে বলল, 'তুমি ওকে পৌঁছে দাও। স্কুল ছুটি তো বারোটায়। আমি নিয়ে আসবো।'

সম্ভবত এটা একটা সমাধান, গার্গী ভাবল, যে এতোটা এগিয়েছে এবং নিজে থেকেই, তাকে আর বেশি চাপ দেওয়া যায় না। বস্তুত, কিছুক্ষণ আগে দীপঙ্করের কথাবার্তা শুনে মনে হয়নি এই প্রস্তাব ওর কাছ থেকেই আসবে।

এখন প্রায় পৌনে ন'টা। গার্গী হিসেব করে দেখল, এখনই বাড়ি থেকে বেরুতে না পাবলেও সওয়া ন'টা নাগাদ দীপ্রকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সে যদি মিনিবাসে ওঠে, তাহলে দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছুনো সম্ভব। কাল 'আর্লি' বলতে সে সওয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা ভেবেছিল। তার মানে লেটই হবে। অবশ্য যদি ট্যাক্সি নেয় এবং রাস্তায় জ্যাম না থাকে, তাহলে আরও মিনিট পনেরো বাঁচাতে পারে। সেই মুহূর্তে সোমেশ্বরের মুখ ভেসে উঠল চোখে। বিরক্ত হলো নিজেরই ওপরে। কাল সে 'আর্লি' শব্দটা ব্যবহার কবতে গিয়েছিল কেন!

'তুমি কি আর চা খাবে?'

দীপঙ্কব ব্রেকফাস্ট সারছিল। বুঝতে পারল ব্যস্ততাব মধ্যেও গার্গী দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে। মাথা নেড়ে না জানাল। তারপর স্কুলের পোশাকে ছেলেকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমি তোমাকে নিয়ে আসবো স্কুল থেকে। যতোক্ষণ না যাই, কারুর সঙ্গে বেরুবে না।'

'তুমি কি দুপুরেও আমার সঙ্গে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'মাকেও থাকতে বলো না !'

'আমি আর একদিন থাকব ।' দীপ্রর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে স্বগতোক্তির গলায় গার্গী বলল, 'ছেলের জ্বর বলে গেল, এখন ক'দিন কামাই করে দ্যাখো ।'

কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলেও এরই মধ্যে নতুন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ল গার্গী । দীপঙ্কর সকাল-সকাল বেরুলে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোয় । দুপুরের খাওয়া যেখানে হোক সেরে নেয়, কিংবা, বাড়ি ফিরবে জানা থাকলে বাড়িতেই ব্যবস্থা থাকে । এদিকটা কমলাই দ্যাখে । আজ দীপঙ্কর ফিরবেই, আজ কী হবে !

এতোক্ষণ এসব ভেবে দ্যাখেনি । একটু আগে সে দীপ্রর দুপুরের খাবার রেঁধে তুলে রেখেছে হটবক্সে, সেইসঙ্গে রাতের মাছের ঝোলটাও রেঁধে রেখেছিল । কিন্তু দীপঙ্করের বাড়িতে থাকা মানে তার জন্যেও ভাতের জোগাড় রাখা । আশ্চর্য, কমলা যদি না আসে ভেবে তাড়াহুড়ো করে সব ব্যবস্থা করলেও এই ব্যাপারগুলো তার মাথায় আসেনি কেন ! খানিক আগে যখন দীপ্রর জন্যে ভাত করল তখনই তো দীপঙ্করের জন্যেও বাড়তি চাল নিতে পাবত !

এসব ভাবনা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অফিসে পৌঁছুনোর সময় নিয়ে ভাবতে শুরু করল সে । তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে স্টিলের বাটিতে চাল বের করে, ধুয়ে, হাত বাড়াল প্রেসারকুকারের দিকে । সন্তান তার, স্বামীও তার, সুতরাং এ কাজগুলোও তার । দীপঙ্করের জায়গায় যদি তাকেই স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনতে হতো ছেলেকে, তাহলেও করতে হতো । তখন অবশ্য ফিরে এসে করলেও চলত ।

দীপঙ্কর বেরিয়ে যাচ্ছে । নেভি ব্লু ট্রাউজার্স, হালকা সবুজ সার্ট ও ব্রাউন মোকাসিনে স্মার্টই দেখায় । যাওয়ার ধরনে ব্যস্ততা স্পষ্ট ।

রান্নঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মনে করিয়ে দেবার গলায় গার্গী বলল 'দুজনের খাবারই থাকবে, গুছিয়ে খেয়ে নিও । বাসন নামিয়ে রাখলেই হবে ।'

পৌনে দশটায় নয়, দশটায়ও নয়, সাড়ে দশটা পার করে অফিসে

পৌঁছুল গার্গী এবং লক্ষ করল, সেকশনের একটি সীটও খালি নেই। আলো ঠিকরোচ্ছে সোমেশ্বরের ঘরেব ঘষা কাচের আড়াল থেকে। ট্যাক্সি পায়নি, সুতরাং মিনিবাসে, তারপর ায় ছুটতে ছুটতে আসবার কারণে যে-হাঁফ শুরু হয়েছিল বুকে, নিজের চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে সেটা সামলাতে গিয়ে অনুভব করল বহুজনের মধ্যে থেকেও এমন একাকিত্ব সে এর আগে বোধ করেনি। বড়ো হলঘরের মধ্যে তাদের সেকশনটা এক পাশে, কাজ চলা এবং বিভিন্ন কণ্ঠের কথা বলার মধ্যে শব্দের যে খাপছাড়া ঐক্য থাকে, মনে হলো সেটাও শুনতে পাচ্ছে না ঠিকঠাক। কেউই দেখছে না তাকে, তবু সে দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। কোনোরকমে চেয়ারে বসে জলের গ্লাসটা তুলবে ভেবেও তুলল না। নিঃশ্বাস সহজ করার জন্যে যেটুকু সময় লাগে নিয়ে ছুটল অডিট সেকশনে মিস্টার চক্রবর্তীর কাছে।

'আমাদের একটা ফাইল আনা হয়েছে এখানে—'

'কোন ফাইল?' প্রশ্নটা করেই গার্গীকে তার সেকশনের সঙ্গে মিলিয়ে চিনতে পারলেন অলোক চক্রবর্তী, 'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা তো রায়সাহেব নিজেই এসে নিয়ে গেলেন সকালে। বলেননি আপনাকে?'

'নিয়ে গেছেন!'

আর কোনো প্রশ্ন ছিল না। পাছে অপ্রতিভ দেখায় এই ভয়ে নিজের যায়গায় ফিরে এলো গার্গী। জল খেল। ব্যাগ থেকে চাবি বের করে ড্রয়ার খুলে কাজের জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে রাখতে রাখতে তাকাল পাশের টেবিলে।

'দীপেনবাবু, বস কি খুঁজেছিলেন আমাকে?'

'না তো!'

'আপনি কতোক্ষণ এসেছেন?'

'যখন আসি। পৌনে দশটায়।' গার্গীকে লক্ষ করতে করতে দীপেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেরি হলো?'

অন্য ড্রয়ার থেকে গতকালের অসম্পূর্ণ কাজের কাগজপত্র বের করতে করতে গার্গী বলল, 'ছেলেকে ছেড়ে আসতে হলো স্কুলে—'

দীপেন ভট্টাচার্যের দাঁতে কিছু আটকে ছিল, জিবের ঠেলায় খুঁচিয়ে

সেটা উগরে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। মুখ তুলতে তুলতে বলল, 'বড়ো স্কুলে পড়ানোর এই এক ঝামেলা।'

বয়সে এবং চেহারায় প্রায় প্রৌঢ়, দীপেন এইভাবেই বলে। দীপ্রকে স্কুলে ভর্তি করার সময় ওদের স্বামী-স্ত্রীকেও ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল স্কুলে, গার্গীর মুখে কথাটা শোনবার পর থেকেই দীপেনের ধারণা এমন স্কুল ভূ-ভারতে নেই। ধারণাটা যখন-তখন প্রকাশ করে ফেলে।

'স্কুলের দোষ নয়।' দীপেনের দিকে তাকিয়ে অশান্তির মধ্যেও কৌতুক খেলে গেল গার্গীর ঠোঁটে, 'কাজের লোক কামাই করেছে, তাই।'

'আপনার বাড়িতেও! কী আশ্চর্য, আমাদের ঝি-টাও ডুব মেরেছে আজ! তার ওপর কোথাও কিছু নেই, বৃষ্টি! দুধ আনতে আমাকেই বেরুতে হলো। অন্য দিন ঝি-ই আনে—'

গার্গী ফিরে গিয়েছিল নিজের ভাবনায়। এটা নিশ্চিত, অডিট সেকশন থেকে ফাইলটা এনে নিজের কাছেই ধরে রেখেছে সোমেশ্বর। তাকে ছাড়া আর কাউকে কাজটা দেবে না, কারণ গতকাল পর্যন্ত যতোটা এগিয়েছে তার সমস্ত কাগজপত্রই এখনো তার হেফাজতে। এখন ফাইলটা চাইবার জন্যে তাকে সোমেশ্বরের কাছেই যেতে হবে।

এরপর সে সোমেশ্বরের ঘরে ঢুকল।

'মিস্টার চক্রবর্তী বললেন ফাইলটা—'

সোমেশ্বর চিঠি সই করছিল। গার্গীকে দেখে পাশের র‍্যাকের ওপর থেকে গোলাপী রঙের ফাইলটা তুলে বাড়িয়ে ধরল তার দিকে।

'আর্লি এসে পড়েছিলাম, নিজেই নিয়ে এলাম।'

'সরি।'

'শব্দটা চেনা লাগছে!' না তাকিয়েই বলল সোমেশ্বর। চিঠির টাইপ করা অক্ষরগুলোয় চোখ বোলাতে বোলাতে বোধহয় খেয়াল করল গার্গীর ছায়া লেটারহেডের দূরত্ব পেরিয়ে স্পর্শ করছে তাকেও। ছায়াটা সরানো দরকার। তখন মাথা নিচু রেখেই বলল, 'সবই তো পেয়ে গেলেন! দেখুন আজ কাজটা শেষ করতে পারেন কি না।'

আর কিছু বলবার থাকে না। ফাইলটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো

গার্গী। পরিষ্কার অপমানিত লাগছে নিজেকে। দুঃখ প্রকাশ করে লাভ হয়নি শব্দটাকে যেভাবে চিনে ফেলল সোমেশ্বর, যেমন তৎপরতায়, তাতে মনে হয় আগেই জানত সে দেরি করে আসবে এবং সরি-ই বলবে। ইঙ্গিতটা স্বভাবের দিকে, মাঝখানের ঘটনাগুলোর কোনো দাম নেই। এসব ক্ষেত্রে উত্তরও তৈরি থাকে। আসল বিষ ছিল শেষের কথাগুলোয়।

টেবিলে ফিরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল গার্গী। অনুভূতির ভিতর নিঃশব্দ আলোড়ন সংযত করতে করতে ভাববার চেষ্টা করল, তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছে শুধুই অপমানিতের বোধ থেকে সে বাইশ বছরের যুবতীর মতো সবাক হতে পারবে না। হয়তো পারত যদি নির্ভরতার জায়গাগুলো চেনা থাকত ঠিকঠাক, যদি দীপ্র না হতো, যদি মাসে যে পাঁচশো টাকা করে এখনো দিয়ে যাচ্ছে বাবাকে, সেটা দায়িত্বে পরিণত না হতো। কিংবা, যদি সে অদূরে বসে থাকা নন্দিতার মতো হতে পারত, যে গাড়িতে আসে এবং ফেরেও গাড়িতে, চাকরি করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে, বলেও তা, ইউনিয়ন না করেও প্রতি মাসে ইউনিয়ন ফান্ডে পাঁচশো টাকা চাঁদা দিতে যার গায়ে লাগে না। সুতরাং ভয় চেনে না ; অনিশ্চিতও বোধ করে কি!

শেষ পর্যন্ত সোমেশ্বরের শেষের কথাগুলোকেই চেপে ধরল গার্গী। আজ সে কাজটা শেষ করতে পারবে না কেন! কাজের নব্বুই ভাগ সেরে রেখেছিল কাল, এই ফাইলে তো আছে মাত্র গোটা তিনেক এনট্রি। সেগুলো খুঁজে, টোটাল দিয়ে, পারসেনটেজ অ্যানালিসিস করতে পারলেই হয়ে গেল। বেশিটাই করবে ক্যালকুলেটর। এ কাজে পনেরো মিনিটের বেশি সময় লাগে না।

তবু, কাজে মন দিতে গিয়ে গার্গী বুঝতে পারল স্বভাবের যে-স্থৈর্যের জন্যে এসব কাজে তার ওপরেই বেশি নির্ভর করে সোমেশ্বর, সেটাই হারিয়ে যাচ্ছে ; ক্যালকুলেটর যে-অঙ্ক দেখাচ্ছে সেগুলোর রিডিং চাপা পড়ে যাচ্ছে সোমেশ্বরের গলার শব্দে। এয়ার কন্ডিশানারের নিয়ন্ত্রিত তাপের মধ্যে বসেও ঘামের অস্বস্তি ফুটছে কপালে, গলায়, বুকে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় চোয়াল শক্ত রাখা।

মিনিট কুড়ির মধ্যে পুরো স্টেটমেন্ট ও নোট তৈরি করে সোমেশ্বরের বেয়ারা জগদীশকে ডাকল গার্গী। পুরো কাজটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'সাহেবকে দাও। আমি আছি, ডাকলে যাব।'

কথাগুলো বলতে পেরে খুশি হলো। ভারটা নেমে যাচ্ছে। এখন সে যথেচ্ছ হতে পারে।

নিজের সীট ছেড়ে উঠে গিয়ে সেকশনের টেলিফোনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলছে কনক বিশ্বাস। সম্ভবত ট্রাঙ্ককল, বাইরের কোনো পার্টির সঙ্গে। ফোনটা থাকে নন্দিতার টেবিলে। নাকের সামনে খসে পড়া কথার আওয়াজ এড়াতে মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে অস্বস্তি ও মজা মিশিয়ে হাসছে নন্দিতা ; এই মুহূর্তে ওব সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় গার্গীও হাসল। তারপর চোয়াল ছাড়াতে ছাড়াতে ভাবল, হলোই বা বস, সোমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কটা অফিসের এবং কাজের, কাজটা করে দিয়েছে—আজকের মধ্যেই দিয়েছে, ব্যস, চুকে গেল। এমন কোনো নির্দেশ তো নেই যে তাকেই উঠে গিয়ে হাতে করে দিয়ে আসতে হবে!

'তাহলে ধরে থাকুন লাইনটা, দেখে বলছি— ।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ব্যস্ত ভঙ্গিতে নিজের টেবিলের দিকে হেঁটে গেল কনক বিশ্বাস। নিরুপায়, অথচ বিরক্ত। সেই সময় সোমেশ্বরের ঘরের দরজায় কোঁ-কোঁ শব্দ হলো। কনককে অনুসবণ করতে করতে চোখ ফিরিয়ে গার্গী দেখল বেল শুনে উঠে যাচ্ছে জগদীশ। ঘরে ঢুকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'সাহেব ডাকছে, যান।'

এতো তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠাবে ভাবেনি। আগের ঘটনার জেরে বিরক্তি এড়াতে পারল না গার্গী। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ভাবল, দেবার আগে স্টেটমেন্টটা সে খুঁটিয়েই দেখেছে, নোটটাও, ওতে এমন কিছু থাকতে পারে না যাতে ক্লারিফিকেশনের জন্যে এখনই ডেকে পাঠাতে হবে। তাহলে কি ভুল থেকে গেল কোথাও!

তবে এবার সে আত্মবিশ্বাস নিয়েই মুখোমুখি হচ্ছে সোমেশ্বরের।

সোমেশ্বর বলল, 'আপনার একটা কল আছে—'

'এখানে !' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে টেবিলে নামানো রিসিভারটা তুলে সোমেশ্বরের দৃষ্টি আড়াল করে ঘুরে দাঁড়াল গার্গী, 'হ্যালো !'

'তোমার লাইন পাওয়া এক ঝকমারি। সারাক্ষণ এনগেজড্ !'

গলার স্বরেই চিনতে পারল দীপঙ্করকে। চাপা গলায় গার্গী বলল, 'কী হয়েছে !'

'প্রব্লেম। আমি দীপ্রকে আনতে যেতে পারছি না।'

'কেন !'

'মিস্টার মল্লিক আজ সন্ধের ফ্লাইটে বম্বে চলে যাবেন। বলছেন এখনই ওঁর সঙ্গে করপোরেশনে যেতে—'

মুহূর্তে রেখা পড়ল গার্গীর মুখে। সে জানে দীপঙ্কর কী বলতে চাইছে, তা সত্ত্বেও হতাশা ও রাগ লুকোতে পারল না।

'এটা সকালেই বলতে পারতে !'

'তার মানে ! সকালে জানলে তো বলব !' দীপঙ্করের স্বরে ঝাঁঝ স্পষ্ট।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে— ।' কথার মানে থাক বা না থাক, অধৈর্য হয়ে পড়ল গার্গী।

'শোনো—', গলা পাল্টে দীপঙ্কর বলল, 'এখনো সাড়ে এগারোটা হয়নি, একটা ট্যাক্সি নিয়ে যদি—'

গার্গী বাধা দিয়ে বলল, 'এইমাত্র অফিসে এসেছি, এখনই যদি বেরুতে হয়—'

'আশ্চর্য ! অফিস বেশি ইমপর্ট্যান্ট,না ছেলে ! আমি তো চেয়েইছিলাম যেতে ! আটকে পড়লে কী করব !'

'আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়।'

দীপঙ্কর আর কিছু বলল না। রিসিভার নামিয়ে রাখলে শব্দ শোনা যেত, সেটা পায়নি, তার মানে ধরে আছে এখনো। ওইভাবে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাপ ছড়াতে লাগল গার্গীর কানের পিছনে, হঠাৎই শূন্য মনে হতে লাগল নিজেকে, বুঝতে পারছে না দীপঙ্করের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী। কিন্তু এভাবে কতোক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়, বিশেষত এমন একজনের সামনে যে ব্যক্তিগতকে মূল্য দিতে চায় না !

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে 'ছাড়ছি' বলে তাড়াহুড়ো করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে একইভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল গার্গী।

কিন্তু, দরজা পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই সোমেশ্বরের গলা শুনে থেমে দাঁড়াতে হলো তাকে।

'ফোনটা আপনার স্বামী মিস্টার ব্যানার্জির তা আগেই জেনেছি।' এই প্রথম তার মুখের ওপর সোজাসুজি দৃষ্টি রেখে সোমেশ্বর বলল, 'ইউ লুক আপসেট। তেমন দরকার থাকলে চলে যেতে পারেন।'

গার্গী বুঝতে পারল না এই মুহূর্তে ঠিক কোন ছায়া পড়েছে তার মুখে। কিংবা টেলিফোনে দীপঙ্করের সঙ্গে কথা বলবার সময় কতোটা প্রকাশ করে ফেলেছে নিজেকে, যাতে কী নিয়ে সমস্যা তা না জেনেও উপযাচক হয়ে তাকে চলে যেতে বলতে পারে সোমেশ্বর। নাকি স্টেটমেন্টটা পাবার পর সকালের ওই খোঁচা দেওয়া কথাগুলো সম্পর্কে অনুতপ্ত বোধ করছিল, এখন সুযোগ পেয়ে শুধরে নিচ্ছে নিজেকে?

কারণ যা-ই হোক, সোমেশ্বরের কথাগুলোই জোর এনে দিল তার নড়বড়ে হাঁটুতে।

বস্তুত, রিসিভার তুলে কলটা দীপঙ্করেরই জানামাত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল সে, নিজেকে নিয়ে বিব্রতও। অফিসের ফোনের এক্সটেনশন নাম্বার দেওয়া ছাড়াও সোমেশ্বরেব ঘরের এই বিশেষ নাম্বারটা সে দীপঙ্করকে দিযে রেখেছিল যাতে না পেলেই নয় এমন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। তখনকার মানসিক অবস্থায় ভেবেছিল এক্সটেনশন লাইন এনগেজড্ পেলে দীপঙ্কর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারত, সোমেশ্বরের ঘরে কেন! কিন্তু, তাহলেও একই কথা শুনতে হতো তাকে—তার পরের সমস্যা অফিস ছেড়ে চলে যাবার কথাটা কীভাবে বলা যাবে সোমেশ্বরকে। এখন মনে হচ্ছে এই লাইনে তাকে ডেকে নিজের অজ্ঞাতেই অনেক ঝক্কি সামলে দিয়েছে দীপঙ্কর। নিজে থেকে তাকে আর বলতে হলো না কিছু।

সোমেশ্বরের কথা শুনে অভ্যাসবশত আবার সরি বলতে যাচ্ছিল গার্গী, সামলে নিয়ে বলল, 'আসলে ওঁর ছেলেকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার

কথা ছিল, আটকে পড়েছেন—'

'বুঝতে পারছি। দিস ক্যান হ্যাপেন। এখনই বেরিয়ে পড়ুন।'

'ধন্যবাদ।'

সোমেশ্বর হাসল। এখন আর ~ঠ হয়ে নেই।

'আপনার স্টেটমেন্টটা দেখেছি। ঠিকই আছে। পরের কাজটা আমি করিয়ে নেব।'

সোমেশ্বরের ঘর থেকে বেরিয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে বেরুবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল গার্গী। অফিসে আসবার সময় দুশ্চিন্তার মধ্যে যতোটা অসহায় লাগছিল নিজেকে এখন আর তা লাগছে না। দীপ্রকে স্কুলে ছেড়ে ট্যাক্সির জন্যে প্রায় পনেরো মিনিট এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে এবং না পেয়ে প্রায় গোটা রাস্তাটাই দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছিল ভিড়ে ঠাসাঠাসি মিনিবাসে, তারপরের ঘটনাগুলোয় আরও খাপছাড়া লাগছিল নিজেকে। সোমেশ্বর সদয় হওয়ায় বেঁচে গেল। এইটাই ভালো হলো, জরুরি কাজটা শেষ করার পরেই ফোনটা এলো, অফিস বা সোমেশ্বর সম্পর্কে কোনো জ্বালা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে না তাকে।

এখন আর কাউকে কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই। তবু যাবার আগে নন্দিতার টেবিল ছুঁয়ে গেল গার্গী।

'চলে যাচ্ছি। আজ আর ফিরব না।'

'কী হলো!'

'ছেলেকে স্কুল থেকে তুলতে হবে। তারপর খাওয়ানো, আগলানো। বুঝতেই পারছ, ঝামেলার একশেষ!'

'এখন বুঝতে পারো বিয়ে না করে কতো ভালো আছি!' নিজের ধরনে হাসল নন্দিতা, 'অসুবিধে হবে দীপেনবাবুর। সকালে দেরি দেখে খোঁজ করছিলেন—'

পুরনো রসিকতা। ইচ্ছে করেই পিছনে তাকাল না গার্গী। ঘড়ির কাঁটায় চোখ বুলিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল সিঁড়ির দিকে। সময়ের হিসেব আগেই করে রেখেছে, সেটা ঠিক হবে চটপট ট্যাক্সি পেয়ে গেলে। অফিসের সময়ের চাপ কমে গেছে, এই সময়টায় আলস্য লেগে থাকে ট্যাক্সির চাকায়,

প্যাসেঞ্জার তোলে যেচে। না পাওয়ার কথা নয়।

ভোরবেলায় বৃষ্টির পর মেঘলা দশা কাটিয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল আকাশ, রোদের দেখা মিলেছিল, যদিও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রখর হয়ে ওঠে তেমন হয়নি। রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখল আবার ছায়া ছড়িয়েছে চারদিকে। অনেকটা নীচে নেমে এসে কয়েকটা চিল অর্থহীন ডানা মেলে ওড়াউড়ি করছে ইতস্তত। তবে এই মেঘে বৃষ্টি হয় না, অন্তত এখনই হবার সম্ভাবনা নেই কোনো। গুমোট ভাবটা বাড়তে পারে। রাস্তার মাঝখানে অনড় পড়ে থাকা একটা কাগজের ঠোঙার দিকে খানিক অপলকে তাকিয়ে থেকে গার্গী বুঝল হাওয়াও নেই এতোটুকু। কিছু দৈন্য কিছু বা সম্ভ্রান্ত হবার চেষ্টা নিয়ে ফ্রী স্কুল স্ট্রিট যেমন থাকে তেমনি, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকালে আরও প্রকট হয়ে ওঠে সামগ্রিক জীর্ণতার চেহারা। তেলেভাজা, মুড়ি-মুড়কি-বাতাসার দোকানের ওপরের দোতলার রঙচটা কাঠের রেলিঙ থেকে ঝুলছে শুকোতে দেওয়া বিবর্ণ শাড়ি ও বহু-ব্যবহৃত ট্রাউজার্স ; আরও একটু দূরে সদ্য কলি ফেরানো নতুন টেলারিং শপের ওপরে কার্নিশে অশত্থের চারা নিয়ে দাঁত বের করে আছে পুরনো ছাদ, তার নীচে জানলায় বাচ্চা কোলে শালোয়ার কামিজ পরিহিতা এক ক্ষয়া চেহারার যুবতী, তার পাশের জানলায়—সম্ভবত এটা অন্য বাড়ি—হাঁটু পর্যন্ত পায়জামা তুলে খালি গায়ে দাঁড়ানো পুরুষটি সিগারেট টানছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। মোটরের হর্নের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রিক্সার ঘণ্টির শব্দ। ওয়েলেসলির দিক থেকে সরু রাস্তা দিয়ে একপাল ভেড়াকে তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে এলো দুটি লোক, সম্ভবত হগ মার্কেটে যাবে। ফ্রী স্কুল স্ট্রিটে ডান দিকে ঘুরে ছিপ্‌টির ঘা খেয়ে এলোমেলো দৌড় দিল দলছুট দু-তিনটি জীব, স্পীডের মাথায় তাদের একটিকে চাপা দিতে গিয়ে অতর্কিত শব্দে প্রচণ্ড ব্রেক কষল একটা নীল রঙের কন্‌টেসা। রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজের ঠোঙাটা চাকায় জড়িয়ে গাড়িটা চলে যাবার পর গার্গী লক্ষ করল সীটের পিছনের কাচে মুখ লাগিয়ে বসে আছে একটা সাদা রোমশ কুকুর, পাশে এক ববচুলের মহিলা। চিন্তিত অথচ চিন্তাহীন নিরপেক্ষতায় দৃশ্যগুলো পেরিয়ে এলো গার্গী। তার কাছে অর্থহীন এসব

দৃশ্যের আড়ালে কোনো গভীরতর ঘটনা আছে কি না তা সে জানে না, যেমন উল্টোদিকের ফুটপাথে হাতে ব্রীফকেস নিয়ে স্টীল-গ্রে স্যুট-পরিহিত যে সুদর্শন যুবকটি এইমাত্র এসে দ'াড়াল, এখন তাকেই দেখছে, তার কাছে গার্গী সবুজ ডুরে শাড়ি সবুজ ব্লাউজ পরিহিতা পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি উচ্চতার, সুঠাম স্বাস্থ্যের এক যুবতী মাত্র, আরও খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়বে যুবতীর মুখের ঈষৎ ডিমের গড়ন, টানা চোখ, গায়ের উজ্জ্বল শ্যাম রঙ এবং এই মুহূর্তের ঔদাসীন্য। তার উদ্বেগ তারই নিজস্ব।

দু-তিন মিনিট ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থেকে কোনো ট্যাক্সির দেখা না পেয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগোবে কিনা ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে চোখে পড়ল রয়েড স্ট্রিট থেকে মিটার উঁচিয়ে এদিকেই আসছে একটা ট্যাক্সি। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল সে। ট্যাক্সিটা কাছে এসে দাঁড়াতে উঠেও পড়ল। সোজা রাস্তায় 'নো এনট্রি' থাকায় যেতে হবে চৌরঙ্গি দিয়ে। তা হোক। অভ্যাসবশত ব্যাগ খুলে টাকা-পয়সার ছোট ব্যাগটা আছে কি না দেখে নিয়ে সীটের গয়ে হেলান দিয়ে নিজেকে আল্‌গা করে দিল গার্গী।

ক্লান্তি টের পাচ্ছে। মনে হলো ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পরে এই এতোটা সময় পর্যন্ত সে যা যা করেছে এবং যে-অবস্থায়, তার মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল না কোনো ; দায়িত্বের সবটাই পালন করেছে প্রায় বাধ্যতামূলকভাবে। যেটা আরও খারাপ লাগছে এখন, হঠাৎ কাজে আটকে পড়া এক কথা—এমন হতেই পারে—কিন্তু কাজের ছুতো ধরে দীপঙ্কর কী করে তাকে বলল কথাগুলো, অফিস বেশি ইমপর্ট্যান্ট, না ছেলে ! সত্যি বলতে, দীপঙ্কর দীপ্রকে আনতে যেতে পারবে না শুনেই গার্গী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অগত্যা তাকেই যেতে হবে, পরের কথাগুলো এসে যায় আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর তিক্ততা ও জ্বালা থেকে। ছেলে কি তার একার ! একই কথা তো বলা যেত দীপঙ্করকেও—ওই যে মিস্টার মল্লিক না কি নাম বলল, তাকে বুঝিয়ে কর্পোরেশনে যাবার ব্যাপারটা পিছিয়ে দিতে, কাজটা কি হঠাৎই এতো জরুরি হয়ে পড়ল যে একদিনের জন্যে ছেলেকে আগলানোর দায়িত্ব নিতে পারছে না দীপঙ্কর ! নাকি সত্যি সত্যি দীপঙ্কর মনে করে তার নিজের কাজটাই কাজ, আর গার্গীর অফিসে

যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোটাই শখের, সময় কাটানোর জন্যে, সুতরাং ওই ভাষাতেই বলতে হবে কথাগুলো ! তাহলে প্রতি মাসে তার অফিস থেকেই পাওয়া মাইনে নামক টাকাগুলো সম্পর্কে কেন এতো হিসেবি হয়ে ওঠে দীপঙ্কর, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও এখনো পরোক্ষে একটা জ্বালা পুষে যায় সে—বিয়ের পরেও কেন গার্গীকে সাহায্য করতে হবে বাবার সংসারে ?

ট্যাক্সি যে-রাস্তায় যাচ্ছে সেটা বাস মিনিবাসের রাস্তা নয় । অনেক দিন পরে এভাবে যাওয়া বলেই গার্গী টের পেল আশপাশের বাহারে বাড়ি ও দোকানগুলোই শুধু নতুন হয়নি, অপরিচিত হতে হতে বদলে দিয়েছে একদা পরিচিত রাস্তার পুরনো চেহারাও । বছর ছ'সাত আগে,তখনো তার বিয়ে হয়নি, লর্ড সিন্‌হা রোডের যে মুসলমান দর্জির দোকানে সে ব্লাউজ সেলাই করতে দিতে এসেছিল দীপঙ্করেরই সঙ্গে—বলতে কি ওদের বাড়ির কাজ করে বলে দীপঙ্করই চিনিয়েছিল দোকানটা, আশ্চর্য, তখন ও গার্গীর ব্লাউজের কাট নিয়েও ভাবত—সেই দোকানটা উঠে গেছে, সেখানে আরও অনেকটা জায়গা নিয়ে চালু হয়েছে ঝকমকে হাল ফ্যাশানের ল্যাম্প-শেডের দোকান । নাকি সে ভুল করছে, দোকানটা ঠিক ওখানেই ছিল না, আরও একটু পিছনে কিংবা এগিয়ে কোনোখানে ! কিন্তু, পিছনের রাস্তায় সেটা চোখে পড়ল না কেন, এগিয়ে যাবার রাস্তাতেও নেই তো ! সবকিছু এমন বদলে গেল কবে !

ট্যাক্সির মধ্যেই খাড়া হয়ে বসে সামনে পিছনে তাকিয়ে এমনভাবে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল গার্গী যেন এখনই সে খুঁজে পেতে চায় স্মৃতিচিহ্নিত জায়গাটা । পেল না । নির্বিকার ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে নিয়ে বাঁক ঘুরল লোয়ার সার্কুলার রোডে ।

দ্রষ্টব্য না থাকায় শূন্যতা এসে গেল দৃষ্টিতে । আস্তে আস্তে অভিমানও । গার্গী এখন নিজেকেই খুঁজছে । নিজের মধ্যে যতো না, তার চেয়ে বেশি দীপঙ্করের মধ্যে ।

পরিচয় থেকে আকর্ষণ বোধ, ক্রমশ ভালোবাসা, তারপর বিয়ে । এসব চেনা যায় বইয়ের চ্যাপ্টার বদলানোর মতো সহজে । তবে গার্গী সরকার হওয়া থেকে গার্গী ব্যানার্জি হওয়াটা সহজ হয়নি । বাড়ির দুটি গাড়ির

একটি তখন দীপঙ্করই ব্যবহার করে। ক্রীম রঙের সেই ফিয়াটে, পাশে গার্গী, এক রবিবার, বিকেলে, তাদের আমতলার বাগানবাড়ি থেকে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে ফিরতে ফিরতে হঠাৎই বলেছিল দীপঙ্কর, 'বাবা কোনো কথা না বললেও মা একটু আপত্তি দেখাচ্ছে। অবশ্য ওটা কোনো বাধা নয়—'

ভাষা এক না হলেও হতে পারে, তবে বক্তব্যে তফাত ছিল না। একটু আগেই একান্তে শরীর দিয়েছে গার্গী ; অনুভূতিগুলোকে তখনো ঠিকঠাক চিনতে না পারার রহস্যে টলটলে হয়ে আছে সর্বাঙ্গ, সঙ্কোচে, কিছু বা ভয়ে এর আগে কখনো দীপঙ্করকে এতোটা কাছের মনে হয়নি।

কথাগুলো স্পষ্ট কানে এলেও মনে হয়েছিল দীপঙ্কব তাকে টানতে চাইছে নতুন কোনো খেয়ালে। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন ?'

'হয়তো এমনিই। হয়তো ভেবেছিল নিজেই দেখেশুনে ছেলের বউ আনবে।'

গার্গী গতকালে ফিরে গেল। দীপঙ্করদের বাড়িতে নীহারকে প্রণাম করে সে উঠে দাঁড়াচ্ছে। চাকরিতে ইন্টারভিউ দেবার সময়েও নিজেকে এতোটা নার্ভাস লাগেনি।

'আমাকে পছন্দ হয়নি ?'

'সেসব নয়। আসলে—', সামনে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা ফাঁকা দেখে নিয়ে স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে সিগারেট ধবালো দীপঙ্কর। তারপর বলল, 'আমাদের বংশে এর আগে কখনো অসবর্ণ বিয়ে হয়নি।'

এটা গার্গীব থামবার জায়গা। কথাগুলোর অর্থ বুঝে থেমে গিয়েছিল সেদিনও। অবাধ রাস্তার আশপাশের দৃশ্য থেকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল কোলের ওপর ফেলে রাখা নিজের হাত দুটির দিকে—এই দুটি হাতের গভীরতম আশ্লেষে শরীরের সমস্ত সংযম ভেঙে একটু আগেই সে গ্রহণ করেছে দীপঙ্করকে, একবারও মনে হয়নি দীপঙ্করের আবেগ শুধু তাকেই নয়, স্পর্শ করছে তার অসবর্ণতাকেও। নিজেকে নিয়ে কখনো যে এভাবে ভাবতে হবে কিছুক্ষণ আগেও তা কল্পনা করতে পারেনি।

ট্যাক্সির মধ্যে, দীপ্রর স্কুলের দিকে যেতে যেতে, অনেকদিন পরে আজ

আবার সেই অনুভূতির মধ্যে ফিরে গেল গার্গী। একই দৃশ্যের মধ্যে হুবহু ফিরিয়ে আনল নিজেকে।

তার স্তব্ধতাই সম্ভবত সচেতন করেছিল দীপঙ্করকে। অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এসে বলল, এসব নিয়ে ভেবো না। মা'র মনটা বড্ড সেকেলে। বলছিল গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করবে। আমি কী বলেছি জানো?'

গার্গী তাকিয়েছিল দীপঙ্করের দিকে। তবে উত্তর শোনবার জন্যেই নয়।

'বললাম বিয়েটা গুরুদেব করবেন না, আমিই করব। গুরুদেব হ্যাঁ বললেও করব, না বললেও করব। আমার কথায় সায় দিল তমসা। আমার বোন আমার চেয়ে তেজী। বলল এই বিয়ে না হলে সেও অসবর্ণ বিয়ে করবে।'

গার্গী জবাব দেয়নি। তখনকার ঘোরের মধ্যে এসব কথার কোনো অর্থ ছিল না। পাশে বসা লোকটির সংস্পর্শে দূরত্ব বোধ করতে করতে ভাবছিল তখনই কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে কি না।

দিন কয়েক ভারাক্রান্ত ও সংশয় বোধ করলেও দীপঙ্করের পরবর্তী ব্যবহারে কোনো খুঁত পায়নি। মুখ ফুটে কিছু বলেনি, কিন্তু অনুতপ্ত লাগছিল ওকে। যতোই অপ্রিয় হোক, ক্রমশ ভেবেছিল গার্গী, আড়ালের কথাগুলো বলে ফেলে ভালোই করেছে দীপঙ্কর। অন্তত সে সতর্ক হতে পারবে। তা ছাড়া, সম্পর্কটা দীপঙ্করের সঙ্গে, দীপঙ্করের জোর থাকলে সে ভয় পাবে কেন!

আর কখনো এসব কথা ওঠেনি। বিয়েটা হয়ে গেল। রেজিস্ট্রি বিয়ে। সই-সাবুদের পরে তাদের ক'জনকে স্কাইরুমে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ওদের মতে অসবর্ণ বিয়ে, তবু, একমাত্র ছেলের বিয়ের রিসেপশনে জাকজমকে কার্পণ্য করেননি রঘু ব্যানার্জি।

কিন্তু, দীপঙ্কর যতোই ভালোবাসার জোর দেখাক, তমসা যতোই কাছের হয়ে উঠুক, এক দিনের হঠাৎ-শোনা কথাগুলো ভুলতে পারেনি গার্গী। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা বুঝতে গিয়ে ক্রমশ একটা জেদও ঢুকে পড়েছিল রক্তে। দাম্পত্য সম্পর্কের স্বাভাবিকতার মধ্যে থেকেও নতুন এই

পারিবারিক জীবনে কী যেন ছিল না, হঠাৎ-হঠাৎ বিচ্ছিন্ন মনে হতো নিজেকে, আশঙ্কায় সঙ্কুচিত লাগত, চাপা বিক্ষোভে সিরসির করত মেরুদণ্ড। একান্তের এইসব অভিজ্ঞতা থেকে সে ক্রমশ যেসব সিদ্ধান্ত নেয় তার একটি, সচ্ছল পরিবারের বউ টাকার দরকার নেই, তবু চাকরিটা ছাড়বে না।

শ্বশুর শাশুড়ীর কথা আলাদা, ব্যাপারটা দীপঙ্করও মেনে নিতে পারেনি। গোড়ার দিকে তেমন কিছু না বললেও অশান্তি শুরু হলো দীপ্রর জন্মের পরে।

'তোমার এই জেদের কারণ বুঝতে পারি না। কী এমন অভাব টাকার !'

'তুমি থাকতে আমার অভাব হবে কেন !'

'তাহলে ! শখ !'

'শখ কেন হবে ! বিয়ের আগেই তো তোমাকে বলেছিলাম চাকরি ছাড়ব না। তুমি রাজি হওনি ?'

'হয়েছিলাম। কিন্তু কোনো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলিনি। তখন দীপ্রও হয়নি।'

গলা চড়বার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছিল দীপঙ্করের। পরের কথাগুলো কোন দিকে যাবে অনুমান করতে না পেরে গার্গী বলল, 'ছেলের কোনো অসুবিধে হলে আমি বুঝতাম না ! আমি একাই চাকরি করছি না, আমার মতো আরও অনেকে করে—'

'তাদের প্রয়োজন আছে, তাই করে। তা ছাড়া—', একটু থেমে বলল দীপঙ্কর, 'বাড়িটা তোমার আমার ইচ্ছের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। বাবা মা বেঁচে আছেন এখনো, তাঁদেরও একটা মতামত আছে।'

'ওঁদের কোন কথাটা না মেনে চলছি !'

চাপটা কোথা থেকে আসছে অনুমান করতে অসুবিধে হয়নি গার্গীর। এবং বুঝতে পেরেছিল, অন্য কেউ নয়, এখনো দীপঙ্করই তার নির্ভরতার জায়গা। তাকে বিয়ে করার ব্যাপারেও তো ওঁদের সম্মতি ছিল না, জোর দীপঙ্করই খাটায়। ভালোবাসার জোর ! হয়তো। ওই পরিবারে নিজেকে অসবর্ণ জেনেও সে যে দীপঙ্করকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি, সেটাও

ভালোবাসারই জন্যে। তাহলে মনের কথাটা ওকে আরও একটু জোর দিয়ে বলতে পারবে না কেন!

'তোমার কাছে যেটা জেদ বা শখ, আমার কাছে সেটাই প্রয়োজন।' যতোটা সম্ভব নরম হয়ে বলল গার্গী, 'আমাদের বাড়ির অবস্থা তো জানো। দাদা মারা যাবার পর আরও খারাপ হয়েছে। বৌদি, দাদার দুই ছেলেমেয়ে—সবই এখন বাবার দায়িত্ব। এদিকে সুমিত্রারও বিয়ে হয়নি। কিছু টাকা আমাকে দিতে হবে বাবাকে, অন্তত বাচ্চা দুটোর পড়ার খরচ—'

দীপঙ্কর বলল, 'সেটা তো আমিও দিতে পারি!'

'তোমার দেওয়া ওরা নেবে কেন!'

'কী বলতে চাও!'

ভালোবাসা আর দয়া এক জিনিস নয়, কথাগুলো এসে গিয়েছিল গার্গীর মুখে, যাদের তুমি গ্রহণ করতে পারোনি তারা তোমার টাকা নেবে কেন! দীপঙ্করের দৃষ্টির পরিবর্তন লক্ষ করে নিজেকে এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'তোমার দায়িত্ব শুধু আমার ভার নেওয়া।'

দীপঙ্কর খুশি হয়নি। গার্গীর শেষের কথাগুলো যে শুধুই আগের প্রশ্ন বা বিস্ময়টাকে আড়াল করার জন্যে, লুডো খেলতে খেলতে স্বামী-স্ত্রীর হালকা আলাপ নয়, বুঝতে পেরেছিল তা।

যতোদূর মনে করতে পারে সেদিন ছিল রবিবার। দুপুরের বিছানা থেকে উঠে গিয়ে চিন্তিতভাবে সিগারেট ধরালো দীপঙ্কর। একটু পরে বলল, 'তোমার বৌদির দাদা তো বিরাট চাকরি করেন, গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ান, বিধবা বোনের দায়িত্বটা তো তিনিও নিতে পারতেন!'

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ ইন্দ্রনাথকে টেনে আনায় বিরক্ত হয়ে গার্গী বলল, 'নিচ্ছেন কি না তা তুমি জানছ কী করে!'

'ও! তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই চলছে চ্যারিটির ওপরে!'

গন্তব্যের নির্দেশ দেওয়া ছিল ট্যাক্সিঅলাকে। দীপ্রর স্কুলের রাস্তায় পৌঁছে লোকটি প্রশ্ন করায় সাময়িক আচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিল গার্গী। এবার বাঁ দিকে। কব্জির ঘড়িতে স্কুল ছুটি হতে আরও তিন-চার মিনিট বাকি। তার মানে জ্যাম ছিল না রাস্তায়, আটকাতে হয়নি

কোথাও। রাস্তা দেখতে দেখতে কখন সে নিজেকেই দেখতে শুরু করেছে, এই মুহূর্ত থেকে সরে গেছে পিছনে, খেয়াল করেনি। এখন অফিসের উদ্বেগ নেই, ছেলেকে তুলতে ঠিক সময়ে পৌঁছুবার তাড়াও নেই—এসবের ছেড়ে যাওয়া জায়গাগুলো হঠাৎই যেন ভরে উঠছে অবসাদে।

গলার ভিতর উঠে আসা হাই চাপতে চাপতে গার্গী ভাবল, এরকম হলো কেন! পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতরটা দেখা যায় না, কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে যে কেউই ভাববে সম্পর্কের এই টানাপোড়েনে জটিলতো নেই কোনো, এ শুধুই বড়লোক-গরীবলোক খেলা, সাজানো গল্পের মতো। সিনেমায় যেমন হয়!

ধক্ করে মনে পড়ে গেল কথাটা। অশোকাদির কথা বলতে গিয়ে আজ সকালেই বলেছিল ইন্দ্রদা। সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ, বুঝতে পারে না গণ্ডগোলটা কোথায়, সুতরাং ধরেই নিয়েছে কথাগুলো তার বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রীর প্রলাপ মাত্র। কিন্তু, বিশেষত এই কথাগুলোই কেন বলে অশোকা? এক সময় তো সুস্থই ছিল ও, ইন্দ্রর সঙ্গে বিয়ের পর বেশ কিছুদিন দেখেছে ওকে, কথাবার্তাও বলেছে, হাবেভাবে কোনো অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি। তারপর হঠাৎই উল্টোপাল্টা হয়ে গেল সব। এমন কি হতে পারে ওই অসংলগ্ন কথাগুলোর মধ্যেই আড়াল হয়ে আছে অশোকার অভিজ্ঞতার এমন কোনো সত্য যা কোনোদিন প্রকাশ পাবে না; অভিজ্ঞতাটা তারই, একার; একারই থেকে যাবে?

কথাগুলো ভেবে নিজেকে কেমন হতভম্ব মনে হলো গার্গীর, যেন সে কোনো দুর্জ্ঞেয়কে স্পর্শ করেছে। বাস্তবিক, বোঝা যায় না জীবনের গতি কোনদিকে, কোথায় অপেক্ষা করে আছে কোন অপ্রত্যাশিত। অশোকার একটা ইতিহাস আছে, তার কথা আলাদা; কিন্তু মাত্র তিনদিনের অসুখে অমরেশ হঠাৎ এইভাবে চলে যাবে কেন! দাদা নিজেও কি ভাবতে পেরেছিল! তার পরেই ভাবল, দীপঙ্করের এতো কাছে থেকেও মাঝে মাঝে কেন নিজেকে এতো একা লাগে তার!

স্কুলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্রুত গেটের দিকে এগিয়ে গেল

গার্গী। ছুটি হয়েছে। এ সময়টা স্কুলের সামনে ও আশপাশে অনেকটা জায়গা গিজগিজে হয়ে থাকে ভিড়ে। মর্নিং সেকশন শেষ হয়ে শুরু হয় আফটারনুন সেকশন— বাচ্চাদের ফেরত নিতে কিংবা পৌঁছে দিতে আসে বাড়ির লোকজন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে গাড়ি ও রিক্সার হুটোপাটি। দীপ্রকে নিয়ে কমলা যাতায়াত করলেও সেটা খুব বেশিদিনের ঘটনা নয়। গোড়ার দিকে, বালিগঞ্জ প্লেসে শ্বশুরবাড়িতে থাকবার সময় সে নিজেই পৌঁছে দিত ছেলেকে, সেখান থেকেই চলে যেত অফিসে। স্কুল থেকে ফেরত নিয়ে যেত বাড়ির ড্রাইভার। কোনো কোনোদিন সঙ্গে আসতেন দীপঙ্করের মা নীহার। ওই গোড়ার দিকেই দু চারদিন ছাড়া দীপ্রকে স্কুলে পৌঁছুতে গার্গী কখনো গাড়ি ব্যবহার করেনি, চলে আসত বাসে বা মিনিবাসে। এ নিয়েও কম অশান্তি হয়নি। দীপঙ্কর শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গায়ে না মাখলেও কটাক্ষ করেছিলেন নীহার, 'বাড়িতে গাড়ি ড্রাইভার মজুত থাকতেও এই লোক-দেখানো আদিখ্যেতার কী মানে হয়, বৌমা! তুমি নিজে যা ইচ্ছে করো, ছেলেটাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন!'

'লোক দেখানোর জন্যে করছি না, মা। দূর দূর থেকে কতো ছেলেমেয়ে পায়ে হেঁটে আসে, ও-ও একটু অভ্যেস করুক না। আমরাও পায়ে হেঁটে স্কুলে গেছি।'

নীহার বলেছিলেন, 'তুমি এমনভাবে বলছ যেন তোমার বাবার দশটা গাড়ি ছিল!'

এই কথা বা এই ধরনের কথা। উপলক্ষ দীপ্র হলেও, প্রায়ই যেমন হতো, বুঝতে অসুবিধে হয়নি নীহারের লক্ষ্য সে-ই। মনে মনে জ্বললেও জবাব এড়িয়ে গিয়েছিল গার্গী। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলায়নি। ছেলের ভালো মন্দ সম্পর্কে ভাববার অধিকার তারই। তা ছাড়া এতে কষ্টের কী আছে, দীপ্র তো কোনো অনুযোগ করেনি।

সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না, যদিও তখন ভাবেনি ওই বাড়ি ওই গাড়ির পরিবেশ থেকে সত্যিই সরে আসবে কোনোদিন।

স্কুলের আধখোলা গেটের মধ্যে দিয়ে নিজের নিজের লোক চিনে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে বাচ্চাগুলো। স্কুলের পোশাকে দূর থেকে

প্রায় সকলকেই একইরকম দেখতে লাগে। গার্গী দেখল, গেটের কাছের জটলা থেকে খানিক দূরে স্কুল কম্পাউণ্ডের ভিতরে আর একটি বাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে গেটের দিকেই চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে দীপ্র। সম্ভবত দেখতে পায়নি তাকে। নাকি দীপঙ্কর নিতে আসবে ভেবে বাবাকেই খুঁজছে। সঙ্গের বাচ্চাটি বেশ ফর্সা ও নাদুসনুদুস চেহারার, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকায় দীপ্রকে রোগাই লাগছে।

নাম ধরে ছেলেকে ডাকল গার্গী, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সরে এলো সামনে।

মা-কে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এলো দীপ্র। দারোয়ানের হাত গলে গেটের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা আসেনি ?'

'বাবা কাজে আটকে পড়েছে, তাই আমি এলাম।' ছেলের স্কুল-ব্যাগ আর ওয়াটার বটলটা নিজের হাতে নিয়ে গার্গী বলল, 'অমন মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন !'

জবাব না দিয়ে গেটের ফাঁক দিয়ে দূরের বাচ্চাটির কিছু বা হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে টা-টা করার ধরনে হাত নাড়ল দীপ্র, তারপর মা-র হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'চলো।'

'ও কি তোমার সঙ্গে পড়ে ?'

'হ্যাঁ। ও-ই তো শান্তনু। তোমাকে বলেছি তো আগে !'

'নাম বলেছ। চোখে তো আজই দেখলাম।'

কয়েক পা এগিয়ে দীপ্র বলল, 'তুমি শান্তনুর মা-কেও চেনো। চেনো না ?'

কথা বলতে ভালো লাগছিল গার্গীর। একটা দ্রুতগামী গাড়ির স্পর্শ বাঁচাতে ব্যস্তভাবে ছেলেকে কাছে টেনে বলল, 'কতোজনের মাকেই তো দেখি। তারপর গুলিয়ে ফেলি। তুমি চিনিয়ে দিও একদিন।'

'হ্যাঁ, তুমি চেনো। আজ সকালেই তো দেখলে !'

'ও মা ! কোন জন ?'

'স্কুলে আসবার সময়। তোমার সঙ্গে কথা বলল না !'

দীপ্রর কথায় আবছাভাবে মনে পড়ল গার্গীর, খুব ফর্সা, মাঝারি গড়নের, একটু বা চাপা মুখের এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার, প্রায় তারই বয়েসী, কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দীপ্রর গাল টিপে দেবার পর তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল সামান্য। তখনই চেনা মনে হয়েছিল, কিন্তু অফিস যাবার তাড়া থাকায় সে গা করেনি। কথা বলেছিল কি না মনে পড়ল না।

'শান্তনু কার সঙ্গে বাড়ি ফেরে ?'

'ওর মা-র সঙ্গে। এখনো আসেনি। অন্যদিন আগেই এসে দাঁড়িয়ে থাকে।'

ফুটপাথ ধরে কিছুটা এগোলে মেন রোডে পড়বে। রোদ এখনো আড়াল হয়ে আছে হালকা মেঘে। ট্যাক্সিতে আসবার সময় গতির উল্টোদিকে ছুটে যাওয়া হাওয়ায় স্বস্তি ছিল, এখন আবার গুমোট লাগছে। স্কুল ছুটির পর এই সময়টায় দশ পনেরো মিনিট ভিড় থাকে উত্তর এবং দক্ষিণ দুদিকেরই বাস স্টপে, ফাঁকা বাস মিনিবাসগুলো স্টপে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ভরে ওঠে স্কুল-ফেরতাদের হুড়োহুড়িতে। এখন তাদেরও গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। ভুল হয়ে গেল, দীপ্রর কথায় কান রেখে গার্গী ভাবল, ট্যাক্সিটা ছেড়ে না দিয়ে দু চার মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখলে স্বচ্ছন্দে ফেরা যেত।

'এসে যাবেন। নিশ্চয়ই দূর থেকে আসতে হয়, বাসে ট্রামে দেরি হয়ে যায়।' গার্গী বলল, 'এই তো, আমাকেই কতো তাড়া করতে হলো ! ট্যাক্সিতে এলাম।'

'তুমি তো অফিসে যাও !' দীপ্র বলল, 'শান্তনুর মা অফিসে যায় না। ওই যে বারান্দা, ওখানে বসে থাকে সকাল থেকে। স্কুল ছুটি হলে শান্তনুকে নিয়ে বাড়ি যায়।'

সামনের একটা দোতলা বাড়ির দরজার বাইরে সিঁড়ি-সংলগ্ন হাত তিনেক চওড়া বারান্দার দিকে আঙুল তুলে দেখাল দীপ্র।

আগে দেখেছে, এখনো লক্ষ করল গার্গী, নানা বয়স ও চেহারার সাত আটজন জড়ো হয়েছে ওখানে। মনে হয় সকলেই বিবাহিতা। তিন

চারজন বসে, বাকিরা দাঁড়িয়ে, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে মত্ত। মর্নিং সেকশনে ছুটি হয়ে গেছে, এরা সম্ভবত আফটারনুন সেকশনের কোনো কোনো বাচ্চার মা বা আর কো'না আত্মীয়া, ঘণ্টা তিন চার ওখানেই কাটিয়ে স্কুল ছুটির পরে বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরবে। হয়তো সকলেই দূরে থাকে, যাতায়াতেই লেগে যায় তিন চার ঘণ্টা, ওই হয়রানি বাঁচাতে অপেক্ষা করে এখানে। এইভাবে আলাপ হয়ে যায় পরস্পরের সঙ্গে। মনে পড়ল, যে-রাস্তা দিয়ে স্কুলে এলো তার পাশেই তেকোণা পার্ক মতন ঘেরা জায়গাটায় গাছের ছায়ায় বসে থাকতে দেখেছিল আরও কয়েকজনকে। সবই ছেলেমেয়েকে ভালো স্কুলে পড়ানোর হেফা। হয়তো স্বপ্ন . ঠিক এইভাবে না হলেও দীপ্রকে ঘিরে এক ধরনের স্বপ্ন কি সে নিজেও দেখছে না ! চাকরিটা না থাকলে সে নিজেও হয়তো এইভাবে এসে বসে থাকত. মিশে যেত ওদের সঙ্গে। এসব ভাবতে ভাবতেই গার্গী ভাবল. না. তা বোধহয় নয় ; চাকরি না থাকলে এতোদিনে তার নিজস্ব কোনো অস্তিত্বও কি থাকত !

বাসস্টপে পৌঁছুবার আগেই দীপ্র বলল, 'ওই তো শান্তনুর মা !'

ভুল দেখেনি। একই ফুটপাথে উল্টোদিক থেকে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে যে এগিয়ে আসছে. এক পলক দেখেই তাকে চিনতে পারল গার্গী, একেই দেখেছিল সকালে। হালকা সবুজ খোলের হলদে পাড়ের শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ। ভার আছে চেহারায়।

সামনাসামনি এসে থমকে দাঁড়াল শান্তনুর মা।

'ছুটি হয়ে গেছে !'

'এইমাত্র। আপনার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।' কথাগুলো বলতে বলতেই নারীত্বের প্রবণতায় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো গার্গীর। কপালে, গলায়, ঠোঁটের নীচে ঘাম, এটা হয়তো ব্যস্তভাবে ছুটে আসার ফল, কিন্তু ছিতরে যাওয়া সিঁদুরের টিপ এবং কাঁধের ওপর বেরিয়ে থাকা ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপে কেমন যেন ধস্ত ও অন্যমনস্ক। গার্গী বলল, 'দেরি হলো !'

'একটা কাজে গিয়েছিলাম।' গার্গীর দৃষ্টি লক্ষ করে সতর্কতা এসে গেল মহিলার ভঙ্গিতে। ব্লাউজের হাতায় ব্রা-র স্ট্র্যাপটা চকিতে ঢেকে অস্বস্তিপূর্ণ

হেসে বলল, 'ঘড়িটাও বোধহয় স্লো চলছে। যাই—'

পায় দৌড়তে শুরু করল শান্তনুর মা।

ওর চলে যাওয়ার দিকে খানিক তাকিয়ে সেই মুহূর্তের অনুমান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল গার্গী। নিতান্তই অচেনা একজন সম্পর্কে অবান্তর ভাবনার মানে হয় না। দীপ্রর কব্জিতে টান দিয়ে বলল, 'দেখছ, কখনো কখনো দেরি হয়ে যায়। শান্তনু কেমন লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তুমি হলে কান্না জুড়ে দিতে!'

দীপ্র বলল, 'খুব দেরি হলে কাঁদতাম।'

'স্কুলের ভেতর থাকলে ভয় পাবার কিছু নেই। কেউ না গেলে ওরা ঠিকানা খুঁজে বাড়ি পৌঁছে দেয়।'

'বাড়িতে যদি কেউ না থাকে?'

গার্গী চুপ করে থাকল।

দীপ্রর প্রশ্নে ভয় আছে। প্রশ্নটা তুলে ও যেন অন্যাদের থেকে আলাদা করে নিল নিজেকে। আসবে বলেও আজ শেষ পর্যন্ত আসতে পারেনি দীপঙ্কর। ও তো ফোন করেই খালাস! এর পর সত্যিই যদি এমন হতো যে কোনো কারণে গার্গীও পৌঁছুতে পারল না, বা দুর্ঘটনায় পড়ল হঠাৎ, তাহলে কে নিত দীপ্রর দায়িত্ব! স্কুল থেকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে কি না জানে না; যদি দিত তাহলেও বাড়ি পৌঁছে তো কাউকে খুঁজে পেত না ছেলেটা!

ভাবনাটা চিরে গেল গার্গীকে। নিজের আশঙ্কা থেকে ছেলের মনের চাপা আতঙ্ক স্পর্শ করল সে। স্বগতোক্তির গলায় বলল, 'বোকা ছেলে! এমন কখনো হয়! সেরকম হলে আমিও অফিসে না গিয়ে ওদের মতো ওই বাড়িটার বারান্দায় বসে থাকব।'

'শান্তনুর মা ওখানে ছিল না তো! ভাগ্যিস ফিরে এলো!'

যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ছেলেকে দেখল গার্গী। জবাব দিল না। জানে, দীপঙ্করকে এসব কথা বললে ও একটাই উত্তর দেবে। কিন্তু, সত্যি সত্যিই যদি তেমন কোনো সমস্যা দেখা দেয়—যদি কালও না আসে কমলা, তার পরেও না আসে, তাহলে কি সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসে

থাকবে বাড়িতে !

মাসান্তে হাজার দুয়েক টাকার অভাবে নিঃশ্বাস থমকে এলো গার্গীর। বাস স্টপে পৌঁছে, উদাসীন দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শান্তনুর মা-র দৌড়ে যাবার দৃশ্যটাই ভেসে উঠল তার চোখে। ওর কতোটা তাড়াতাড়ি ছেলের কাছে পৌঁছুবার জন্যে, কতোটা তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে, এখনো বুঝতে পারছে না ঠিকঠাক।

হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। দীপ্র আবার জড়িয়ে ধরল।

'মা ?'

'বলো !'

'শান্তনু বলছিল একদিন আমাদের বাড়িতে আসবে—'

'বেশ তো। আসবে। তোমার বন্ধুরা কেউই তো আসে না ! শান্তনুকে বোলো আসতে—'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না দীপ্র। একটু পরে বলল, 'তুমি ওর মা-কে বললে পারতে !'

'তুই কি আগে বলেছিলি !' নিজেকে সহজ করে নিয়ে সস্নেহে ছেলের দিকে তাকাল গার্গী, 'ওর মা-কে তো চিনিও না ভালো করে।'

ওপরে মুখ তুলে গার্গীর চোখে চোখ রেখে কিছু বুঝবার চেষ্টা করল দীপ্র। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওর মায়ের নাম জানো না ?'

হেসে মাথা নাড়ল গার্গী। দৃষ্টি আবার রাস্তায়, দূরে। চারদিকে আলোর তারতম্য দেখে মনে হয় মেঘের আড়ালে মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করছে রোদ। পিচের রাস্তায় ফুটবোর্ড রগড়ে একটা ডাবল ডেকার এলো এবং চলে গেল। বাসস্টপ হালকা হচ্ছে ক্রমশ। পর পর ছুটে আসছে দুটো মিনিবাস। একটা অবশ্যই তাদের দিকে যাবে।

'শান্তনুর মায়ের নাম গীতশি। গীতশি দে। ওর বাবার নাম সুবোধ দে।'

'গীতশি ! না গীতশ্রী ?'

'হ্যাঁ।'

'তুই জানলি কী করে !'

'আমাদের আন্টি একদিন জিজ্ঞেস করছিল সবাইকে। তখন। শান্তনুরা সোদপুরে থাকে। ট্রেনে চড়ে যেতে হয়।'

সবজান্তার ধরনে শান্তনু সম্পর্কে জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করে গেল দীপ্র। শুনলে মনে হবে না একটু আগেই ভয়ের কথা বলেছে সে, বলেছে স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনতে দেরি হলে তার কেঁদে ফেলার সম্ভাবনার কথা, এমনকি বাড়ি ফিরে কাউকে দেখতে না পাওয়ার আশঙ্কার কথা। একরত্তি অস্তিত্ব ; ওর বয়সে গার্গী বা দীপঙ্কর স্কুলের ছায়া মাড়ায়নি। নিজেকে যেটুকু মনে পড়ে গার্গীর, বোধবুদ্ধিও হয়নি। হাতেখড়ি হয়েছিল পাঁচে পৌঁছে। তারপর বাড়ির কাছেই স্কুলে। তখন অবশ্য থাকত শ্যামবাজারের দিকে। পাড়ার দঙ্গলে মিশে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরত এক্কা-দোক্কা খেলার সহজে। মা দাঁড়িয়ে থাকত দরজায়, কখনো মনে হয়নি কেউ থাকবে না।

দীপ্র এই বয়স থেকেই এসব ভাবছে। তাহলে কি স্কুলে গিয়েও ও ভয়ে ভয়ে থাকে সারাক্ষণ!

নিশ্চয়ই থাকে, গার্গী অনুমান করল, হঠাৎ ভাবনা থেকে কোনো শিশু এতোটা গুছিয়ে বলতে পারে না। আজ কথা উঠল বলেই বলে ফেলল তরতর করে। সকালে কমলা না আসায় ওকে নিয়ে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টানাপোড়েন চলছে, সেই সময় একবার বেঁকে বসেছিল ছেলেটা, বলেছিল আজ স্কুলে আসবে না। সম্ভবত নিরাপত্তার অভাব থেকে। ওটাকে নিতান্তই জেদ ভেবে ধমক দিয়ে গার্গী বলেছিল স্কুলে না গেলে একা ফেলে যাবে বাড়িতে। দীপ্র চুপ করে যায়। তার পর থেকে স্কুলের গেটে ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত একটি বাড়তি কথা বলেনি। এখন মনে হচ্ছে ধমকটাকেই সত্যি ভেবে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল ও।

উচিত হয়নি, একেবারে উচিত হয়নি। এর পর ওকে কিছু বলার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে তাকে। ছেলে ভুল বুঝতে শুরু করলে সে দাঁড়াবে কোথায়!

এক ধরনের আবেগে চঞ্চল বোধ করলেও নিজেকে সামলে নিল গার্গী। ঘন চোখে দেখল ছেলেকে। শুকনো লাগছে সামান্য। হয়তো

খিদেয়। কমলার কাছে শুনেছে স্কুল থেকে ফিরে ওর ইউনিফর্ম ছাড়ার তর সয় না, খেতে বসে সঙ্গে সঙ্গে। ঘুমিয়েও পড়ে। মানসিক চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কি না কে জানে! অনেকদিন পরে স্কুলের দিনে এতোটা সময় জুড়ে কাছে পাচ্ছে ছেলেকে। আজ দেখতে হবে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওকে কতোটা নিশ্চিন্ত করা যায়।

ছেলেকে নিয়ে মিনিবাসে উঠে গার্গী ফিরে এলো নিজের মধ্যে। মুহূর্তের 'আবেগ' সেই মুহূর্তটিকেই বড়ো করে দেখায়; আরও সব মুহূর্ত ও তাদের ভিতরের বাস্তব জুড়ে জুড়ে ব্যাপ্ত যে-সময়, তুচ্ছ হয়ে ওঠে তা। এখন নিজেই বুঝতে পারছে একদিনের স্বাভাবিকতায় জীবন গড়ায় না। গতকাল যেমন সে আজকের দিনটিকে কল্পনাও করতে পারেনি, তেমনি আজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠার চেষ্টা আগামীকাল ওলোটপালোট হয়ে যাবে কি না কী করে জানবে! সে নিজেই কি নিরাপদ, কিংবা দীপঙ্কর? এ নিয়ে দীপঙ্করের সঙ্গে কথা হয়নি কখনো, কিন্তু প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করতে পারে, পরস্পরকে জড়িয়ে বেঁচে থাকার আগ্রহ থেকে ক্রমশ প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে তারা। কেন এমন হলো! যাকে সর্বস্ব দেবে বলে তৈরি হয়ে এসেছিল, তার কাছে হেরে গেলে সে-ই তো খুশি হতো সবচেয়ে বেশি। তাহলে দীপ্রকে নিয়েও সংশয়ের সুযোগ থাকত না।

দীপ্রকে আজ অন্যরকম দেখছে। বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সারল এতোটুকু ঝামেলা না করে। কিন্তু, ঘুমোবার লক্ষণ নেই। খানিক এপাশ ওপাশ করল বিছানায়, তারপর উঠে গিয়ে চক্কর দিয়ে এলো এ ঘর থেকে ও ঘরে। বহুদিন আগে ওকে একটা রঙিন ছবিঅলা 'ক্যাট অ্যান্ড মাউজ' বই কিনে দিয়েছিল দীপঙ্কর, তখন ওটাই ছিল ওর দিনরাতের সঙ্গী। যেমন হয়, নিজেরই খেয়ালে তারপর ঢুকে পড়েছিল অন্য খেলায়। আজ আবার ওর সেই বইটার কথা মনে পড়েছে। খুঁজে দিতে হবে।

গার্গী মনে করতে পারছিল না শেষ কবে দেখেছে বইটা, রেখেছেই বা কোথায়। ছেলের আবদারে জেরবার হয়ে সম্ভাব্য যতোগুলি জায়গা আছে খুঁজে দেখল। কোথাও নেই। যেখানে থাকবার কোনো সম্ভাবনা

নেই—যেমন ছোট টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখা দীপঙ্করের ব্যবসার কাগজপত্র ফাইলের মধ্যে, আঁতিপাতি করল সেখানেও। তার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে পায়ে ঘুরছে ছেলেটাও। সামান্য বিব্রত বোধ করলেও ব্যাপারটা নিজেও উপভোগ করছিল সে। ছেলের অর্থহীন বায়নায় নিজেকে অবাধে ছেড়ে দেবার এমন সুযোগ বড়ো একটা হয় না আজকাল। শেষে মনে পড়ল, ঘরের পুরনো জঞ্জাল সাফ করার সময় কিছু জিনিস বিলিয়ে দিয়েছিল কমলাকে, দীপ্রর বাতিল খেলনা, ছিঁড়ে যাওয়া ছবির বইটইও ছিল তার মধ্যে। ক্যাট অ্যান্ড মাউজ-টাও চলে গেছে ওই সঙ্গে।

সত্যি বললে পাছে নতুন কোনো জেদ চাপে, সেই ভয়ে এড়িয়ে গেল গার্গী। দীপ্রর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ক্লান্ত, হাইও তুলল একবার, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক আজ জেগে থাকতে চাইছে ও। একটা নতুন আর আরও ভালো ছবিঅলা বই কিনে দেবার প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়ে ভালিয়ে ছেলেকে বিছানায় টেনে আনল গার্গী। আজ আর সে অফিসে যাবে না, দীপ্রর প্রশ্নের উত্তরে সেটাও বলতে হলো বার কয়েক, এমনকি দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে আজ তারা কোথাও বেড়াতে যেতে পারে, সে-কথাও বলল।

ঘুমে শরীর কাঁই হয়ে থাকলেও কেন ঘুমোবার আগ্রহ নেই দীপ্রর, সেটা বুঝতে পারছে এতোক্ষণে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাকে 'অফিসে যাবার ব্লাউজ' ছেড়ে স্লিভলেস পরতে বাধ্য করল— ইদানীং বাড়িতে থাকলে গার্গী যা পরে, তার পরেও যেভাবে ঘেঁসে এলো তার শরীরে তাতে মনে হয় সন্দেহ যায়নি পুরোপুরি।

গাঢ় চোখে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর শরীরে নিঃশ্বাসের ওঠানামা লক্ষ করতে করতে গার্গী ভাবল, এতোটুকু ছেলের মনে এতো অবিশ্বাস কেন! কোনো প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে রাখেনি এমন তো হয়নি কখনো! নির্ভরতার ব্যাপারে তাহলে কি ও তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে কমলাকে!

হয়তো। দীপ্র শিশু, ওকে আর কী বলবে! আজকাল গভীরে গেলে বিশ্বাসের অনেকগুলো জায়গাতেই চোখে পড়ে ফাটল। কিছু বা অস্পষ্ট

হলেও চেনা যায় সেগুলো। সম্পর্কগুলো এমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন!

অন্যমনস্কতার মধ্যে এসব ভাবতে ভাবতে নিঃশ্বাস উঠে এলো তার।

বিছানায় শুয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকল গার্গী। চুপচাপ। আকাশের পরিবর্তন হয়নি। বরং বাড়ি ফেরার পর যেটুকু রোদের আভা বাইরের দেয়াল ছুঁয়ে ছিল এখন তাও অদৃশ্য। যেন দুপুরেই বিকেল শেষের আলো থম মেরে আছে চারদিকে। হাওয়া আছে কি নেই বোঝা যায় না, গুমোটও লাগছে না তেমন। যেটা আশ্চর্যের, কাজের দিন দুপুরে পাড়াটা যে এমন নিঝুম হয়ে থাকে এর আগে কখনো খেয়াল করেনি তা। অনেকক্ষণ পরে একটা রিক্সার মন্থর গতিতে চলে যাওয়ার শব্দ শুনল সে। তার পরের শব্দটা দোতলায় কমোড ফ্লাশ করার। শব্দগুলো মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এলো স্তব্ধতা। সুতরাং, নিঃসঙ্গতাও।

একটু আগে ভেবেছিল দীপ্র ঘুমোলে সেও ঘুমিয়ে নেবে কিছুক্ষণ। কিন্তু ঘুম এলো না। চোখে অনুভূতির শুষ্কতা থেকে মনে হয় এইভাবে দিনের পর দিন জেগে থাকতে পারবে। মনে হলো, এই দুপুরের মতোই নিঃশব্দ, বড়ো গতানুগতিক জীবন তার, হয়তো বা তাদের, মাঝেমধ্যে উটকো ঝামেলা আর টেনসন ছাড়া সেখানে আর কিছুই ঘটে না, যা থেকে পেতে পারে কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ, অন্যরকম হবার সুযোগ।

দীপঙ্কর কখন বাড়ি ফিরবে ঠিক নেই। ছেলের ভার গার্গী নেবার পর সে যথেচ্ছ হতে পারে, হয়তো ফিরবে সন্ধে পার করে, রোজ যেমন ফেরে। তাহলে, একটু আগে দীপ্রকে যেমন বলল, তিনজনে একসঙ্গে বেড়াতে যাবার প্ল্যানটাও ভেস্তে যাবে। কিন্তু দীপঙ্কর যতক্ষণ না ফেরে ততোক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে। তার মানে সামনের চার পাঁচ ঘণ্টা সময় বাড়িতে বসে দীপ্রকে পাহারা দেওয়া ছাড়া কিছুই করবার নেই। এই সময়টায় শুধুই শুয়ে বসে বাড়িতে না কাটিয়ে পার্ক সার্কাসে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারত। আগে খেয়াল হয়নি ; হলে স্কুল থেকেই উল্টোদিকের বাস ধরে চলে যাওয়া যেত ওখানে।

কদিন ধরেই ওঁদের জন্যে চঞ্চল হয়ে আছে মনটা। বিশেষত বাবার

জন্যে। প্রমোদ চড়া ডায়াবিটিসের রোগী। হার্ট অ্যাটাকও হয়ে গেছে একবার। পেনসনের টাকা, ইন্দ্রদার সাহায্য, সুমিত্রার স্কুলের চাকরি আর মাসে মাসে তার দেওয়া পাঁচশো টাকা—কুড়িয়ে বাড়িয়ে চলার এই ব্যবস্থা নিশ্চিন্তি দিতে পারেনি বাবাকে ; সকাল সন্ধে নিজেও বেরোন টিউসনে। এ যেন ফুটো বালতির জল, যতোই কল খুলে রাখো কখনোই টই-টম্বুর হয় না। প্রমোদকে দেখে বুঝতে পারে শুঁড়ি-শুকানো গাছের মতো যে-কোনোদিন মাটি উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়বেন। সম্ভবত প্রমোদও বুঝতে পারেন সেটা। সত্যি বলতে, আজ ভোরে তাদের দরজায় অপ্রত্যাশিতভাবে ইন্দ্রকে দেখে প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল গাছটা পড়ে গেছে। ইন্দ্র আশ্বস্ত করলেও চিন্তা যায়নি। সামনাসামনি দেখা হয়নি অনেকদিন। ও বাড়িতে টেলিফোনও নেই যে অফিস থেকে ফোন করে খোঁজখবর নিতে পারে।

মনে মনে হিসেব করল গার্গী, অন্তত তিন সপ্তাহ বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ নেই কোনো। এর মধ্যে সুমিত্রা এসেছিল একদিন। বিকেলের সেই সময়টায় সে বা দীপঙ্কর কেউই বাড়িতে ছিল না—দীপ্রকে নিয়ে কমলাও বেরিয়েছিল খুচরো বাজার করতে। বুদ্ধি করে ওপরতলায় বেল দিয়ে সুরমাকে খবরটা দিয়ে গিয়েছিল সুমিত্রা। বলে গেছে সকলে ভালো আছে এটুকু জানিয়ে দিতে। সুমিত্রা এমনিই তাদের খোঁজখবর নিতে এসেছিল, নাকি দরকার ছিল কোনো, বোঝা যায়নি। যাবো যাবো করেও তারপর যাওয়া হয়নি আর।

গার্গী অনুভব করতে পারে শ্বশুরবাড়িতে থাকবার সময় নানা অসুবিধের মধ্যেও ঘোরাফেরায় যতোটা স্বচ্ছন্দ ছিল সে এখন আর তা নেই। বালিগঞ্জ প্লেস থেকে তার বাপের বাড়ির দূরত্ব বেশি নয়, যে-কোনো ছুতোয় একবার বাড়ি থেকে বেরুতে পারলে পাঁচ দশ মিনিটের জন্যে ঘুরে আসা যেত। কখনো একা, কখনো দীপ্রকে নিয়ে। এদিকে বাড়ি নেবার পর দূরত্ব বেড়েছে। অফিসে যাওয়া আর অফিস থেকে বাড়ি ফেরা, হিমসিম খেতে হয় দুটো নিয়েই। একটা চাপা টেনসন কুরে খায় সব সময়। এর ওপরে আছে সংসার সামলানোর ঝক্কি, বাজার হাট করা। থলি হাতে বাজারে বেরুনো বা বাজার থেকে ফেরা দীপঙ্করের ধাতে সয়

না—আসলে এসব ও করেইনি কোনোদিন। বাধ্য হয়ে এই কাজগুলোও করতে হয় তাকে।

'আমার অবস্থা দেখে তোমার মায়া হয় না!' একদিন বলেছিল দীপঙ্করকে। একটু ভেবে নিয়ে দীপঙ্কর জবাব দিয়েছিল, 'সস্তা মায়া দেখিয়ে লাভ কি! অবস্থাটা তুমি নিজেই তৈরি করেছ।' তারপর, 'যেদিন ভালো লাগবে না বলবে। রাস্তার ধারে নতুন হোটেল খুলেছে, ওখান থেকে ভাত মাছ এনে দেবো।'

লাভ নেই জেনে কথা বাড়ায়নি গার্গী।

আজকাল এইভাবেই কথা বলে দীপঙ্কর, ভিতরটা কেমন যেন শক্ত হয়ে থাকে সব সময়। নড়াচড়া যেটুকু না করলেই নয় তার বেশি করে না। মাঝে মাঝে বসবার ঘরে গিয়ে একাই বসে থাকে চুপচাপ, গার্গী ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তখন দীপঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় চারপাশের মধ্যে থেকেও ও ক্রমশ আলাদা করে নিচ্ছে নিজেকে। দীপঙ্কর বাড়িতে থাকলে সেও নড়তে চায় না। কেমন যেন দূরবর্তী, অচেনা লাগে। পাছে ও আরও দূরে সরে যায় এই ভাবনায়।

ওকে সঙ্গে নিয়ে যে পার্কসার্কাসে যাবে এমন সম্ভাবনা কম। দীপঙ্করের উৎসাহ নেই। বরং যতো দিন যাচ্ছে ততোই যেন শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর অবজ্ঞার ভাব। এটা লক্ষ করে, দীপঙ্কর মুখ ফুটে কিছু না বললেও, নিজের মনেই ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়া সম্পর্কে কেমন একটা বাধা এসে গেছে গার্গীর। মনে হয় পছন্দ করবে না ও। সেদিন সুমিত্রা এসেছিল শুনেও কোনো কৌতূহল দেখায়নি। যেন অপরিচিত কেউ, নামটামও শোনেনি!

আসলে, নিজেদের সম্পর্কটা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে গার্গী, বালিগঞ্জ প্লেসে দীপঙ্করের স্বজনদের মধ্যে সে যতোই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করুক, নীহার তাকে যতোই অপছন্দ করুন, দীপঙ্কর বিশ্বাস করে দোষ তার স্ত্রীরই। কোনো স্ত্রী বা বাড়ির বউকেই এতোটা স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। কিছু কিছু ব্যাপার গার্গী যদি মুখ বুজে সহ্য করে নিত—বিশেষ করে ছেড়ে দিত চাকরিটা, তাহলে এসব ঘটনা ঘটত না।

যে যেমন ভাবে সেইভাবেই বিশ্বাস করতে চায়। গার্গী জানে, সব বুঝে, অনেকটা নিজের চোখে দেখে এবং কানে শুনেও কেন দীপঙ্কর এখনো আঁকড়ে ধরে আছে নিজের বিশ্বাসটাকে। তাকে ও দেখেছে নিজের স্ত্রী হিসেবে, রঘুনাথ ও নীহারের পুত্রবধূ হিসেবে, ওর ঔরসজাত সন্তান দীপ্রর মা হিসেবে। সংস্কারের এই ছাপগুলো ওর নিজেরই দেওয়া, যাতে শুধু এইসব পরিচয়ের নিয়ন্ত্রণেই বাঁধা পড়ে থাকে গার্গী। এগুলো মিথ্যে নয়, গার্গী নিজেও কি এই পরিচয়গুলোতেই জড়াতে চায়নি নিজেকে! কিন্তু এ ছাড়াও যে একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে তার—গার্গী হিসেবে, একজন ব্যক্তি হিসেবে, যার ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে, মান অভিমান আছে এবং, যেটা সবচেয়ে বড়ো কথা, আছে আত্মবোধ, এগুলো দেখেনি। দেখলে বুঝত, অনুভবও করতে পারত, শুধুই সামাজিক পরিচয়ের অজুহাত দিয়ে মানুষের সহ্যশক্তি বাড়ানো যায় না। মানুষ পরিচয়ের স্বীকৃতিও চায়।

ভাবনার ভার চেপে বসেছিল বুকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে পরিপার্শ্বও হারিয়ে গিয়েছিল যেন। ঘরের পাখা চলছে, তবু বাতাসটা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগায় খেয়াল করল বৃষ্টি নেমেছে। জোরে নয়, কিন্তু ওপর থেকে নীচে তির্যক ভঙ্গিতে নেমে আসা ঝিরঝিরে রেখাগুলো চোখে পড়ছে স্পষ্ট। আলো ম্লান হয়েছে আরও। এরপর হয়তো জোরেই নামবে।

গার্গী উঠল। যেরকম বেঘোরে ঘুমোচ্ছে দীপ্র তাতে মনে হয় না চট করে জাগবে। ভিতরের বারান্দার যেদিকটা খোলা সেখানে লম্বা করে টানা তারেব ওপর শুকোচ্ছে সকালে কাচা জামাকাপড়. রোদ না পেয়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে এখনো। বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজবে ভেবে সেগুলো তুলে বারান্দাতেই জড়ো করে রাখল চেয়ারের ওপর। ডাইনিং টেবিলের ওপর থেকে জ্যামের শিশি চাপা দেওয়া ভাঁজ করা খবরের কাগজটা তুলে নিল। সকালে ওইভাবেই রেখে গেছে দীপঙ্কব। চোখ বোলানোর ইচ্ছে সত্ত্বেও উৎসাহ পেল না। তারপর বসবার ঘরে এসে রাস্তার দিকের জানলা খুলে দাঁড়াল।

ভোরবেলায় যে-চেহারায় দেখেছিল সেই একই চেহারা, গার্গীর মনে

হলো একই আকাশ দেখছে। পচতে শুরু করা পাতার মতো ঘোলাটে মেঘের মধ্যে গুড়গুড়ে একটা শব্দ উঠতে উঠতে থেমে গেল। বৃষ্টিতে বেগ নেই তেমন, শোবার ঘর থেকে যতোটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে কম। হয়তো থেমেও যাবে এক্ষুনি। চাল-ধোয়া জলের গন্ধের মতো নরম গন্ধ ফুটে আছে চারদিকে। বৃষ্টি বাঁচাতে মাথায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কাপড় টেনে ভিজে রাস্তা দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে দুজন মহিলা। একজন অল্প বয়েসী, মুখের ঢল এবং গলায় ও হাতে গহনার বহর দেখে মনে হয় বিয়ে হয়েছে নতুন ; ওদের আগে আগে হাঁটছে ধুতি পাঞ্জাবি পরা একটি যুবক এবং এক কিশোর। সামনের বাসস্টপ থেকে আর এক স্টপ এগোলে সিনেমা হল, হয়তো ম্যাটিনি শো-র যাত্রী। ওরা যেদিকে গেল সেদিক থেকে গা শোঁকাশুঁকি করতে করতে এগিয়ে এলো দুটি কুকুর। পিছনে ট্যাক্সির হর্ন, ট্যাক্সিটা সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় দেখল ভিতরে যাত্রী নেই কোনো। ছাতা মাথায় এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছে ডাক পিওন। বড়ো রাস্তার দিক থেকে একটা লরি বা ট্রাকের গা ঝাড়ার শব্দ শুনে এদিকেই আসবে মনে হলো। এলো না। একটা কথা মনে পড়ল, কী সূত্রে যেন অফিসে নন্দিতা বলেছিল একদিন, 'এই যে কানের পাশে সারাক্ষণ কেউ না কেউ বকর-বকর করছে, ডায়লগ আউড়াচ্ছে—যতোই বিরক্তিকর হোক, এগুলোই টেনে রাখে। কতো হাবিজাবি গল্প উপন্যাস সিনেমা দ্যাখো না, সংলাপের টানেই তরে যায় ! মানুষের গলার শব্দে একটা বাঁচার মোহ থাকে।' কেন মনে পড়ল, জানে না।

বৃষ্টিটা ধরে আসছে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবার পর গার্গী এক দৃষ্টিতে গেটের বাইরে সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকল যেখানে সকালে গাড়ি রেখেছিল ইন্দ্র। বম্বে না দিল্লি, সন্ধের ফ্লাইটে কোথায় যেন যাবে বলেছিল ! মনে পড়ল না। পরিবর্তে দূর থেকে হঠাৎই কাছে এগিয়ে এলো অশোকা। সিনেমায় যেমন হয়। এক-একটা শব্দ থাকে, অর্থহীনতায় হারিয়ে গিয়েও হঠাৎ-হঠাৎ ফিরে আসে আবার, যেন কিছু বোঝাতে চায় ! সকালে আসতে পারেনি কমলা, জোর করে ভাবল গার্গী,

কিন্তু তার পরেও আসতে পারত ; ও নিশ্চয়ই জানে দীপ্রকে আগলাবার জন্যে কেউ না কেউ থাকবে বাড়িতে। দেখা যাক বিকেলে টগরের মা এলে ওর মুখে কোনো খবর পাওয়া যায় কি না। কাছেই কোনো বাড়ি থেকে পুরুতের ঘন্টি নাড়ার শব্দ কানে এলো, শাঁখের শব্দ। এই অবেলায় কে আবার কোন পুজোয় মেতে উঠল ! শাঁখের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বিশৃঙ্খলা এসে গেল চিন্তার মধ্যে। এর পরের দৃশ্যে উদভ্রান্তের মতো ছুটে আসতে দেখল গীতশ্রীকে। শান্তনুর মা। দীপ্র চিনিয়ে না দিলে সে চিনত না। কিছু ছিল ওর দ্রুত হেঁটে যাওয়ার ধরনে, যা তখন বুঝতে পারেনি, এখনো পারছে না।

গার্গী দাঁড়িয়ে থাকল। আদ্যন্ত আচ্ছন্নতার মধ্যে এখন নিজেকেই দেখছে।

প্রায় ছ' বছর পরে গুরুদেব আসবেন বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। খবরটা আগেই দিয়েছিল দীপঙ্কর। বাড়ির সংস্কার মানতে মানসিকভাবে তৈরি করেছিল তাকে। ঘাট উঁচু বড়ো রুপোর থালায় জল নিয়ে পা ধুইয়ে আপ্যায়ন করতে হবে গুরুদেবকে। কাজটা বাড়ির বউয়ের। আগে নীহার করতেন। তবে তাদের বিয়ের পর এই প্রথম আসছেন তিনি, এবার নতুন বউকেই করতে হবে। তমসাও বুঝিয়েছিল সেরকম। 'আমার ভাগ্য ভালো', ঠাট্টা করে বলল, 'গুরুদেবঅলা বাড়িতে বউ হয়ে আসতে হয়নি।'

এসব আগে কখনো শোনেনি গার্গী, দেখেওনি। তাদের বাড়িতে ফি বেস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো হতো বটে, এখনো হয় ; পটের সামনে পাঁচালি পড়তে সেও বসেছে কখনোসখনো ; এর বেশি নয়। হোক গুরুদেব, এক ঘর লোকের সামনে একজন অচেনা পুরুষের পা ধুইয়ে দিতে হবে ভেবে অস্বস্তি লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ভেবেছিল যে-বাড়ির যে-নিয়ম, এ ব্যাপারে আপত্তি করলে অযথা অশান্তি শুরু হবে। কী লাভ ! জীবন একটাই, তিরিশ বছরে পৌঁছে ভাবা যায় তার প্রায় অর্দ্ধেক পার করে এলো ; বিয়ে, বাচ্চা, সবই হয়ে গেল — ভবিষ্যতের দৃশ্যটা চেনা যায় স্পষ্ট, এখন অন্যরকম হবার চেষ্টায় নতুন কিছুই পাবে না। এসব ভেবে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল গার্গী। বিয়েতে বাধা না দিলেও এ বাড়িতে

বউ হয়ে আসবার পর থেকেই লক্ষ করেছে তার সম্পর্কে নীহারের মনের ধোঁয়া কাটেনি, একটা অসন্তোষের ভাব যেন সারাক্ষণ লেগে থাকে চোখেমুখে। এই একটা সুযোগ, এখন সে বাধ্যতা দেখালে হয়তো ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে, অন্তত নরম হবেন একটু। দীপঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়েও এটা করা দরকার।

কিন্তু, অদ্ভুতভাবে উল্টেপাল্টে গেল সব। গুরুদেব আসবার আগের দিন হঠাৎই আরও গম্ভীর হয়ে গেল নীহারের মুখ। রঘুনাথ এমনিতে সাতে পাঁচে থাকেন না, সেদিন তাঁকেও অন্যরকম লাগছিল। গার্গী কিছুই বুঝতে পারছিল না।

অফিস থেকে ফিরেছে একটু আগে। তমসা তাকে ডেকে নিয়ে গেল আড়ালে।

'তোমার শুনতে খারাপ লাগবে, বৌদি। কিন্তু ব্যাপারটা তুমি মেনে নাও।'

'কী হয়েছে!'

'মা খুব আপসেট।' সামান্য ইতস্তত করে বলল তমসা, 'গুরুদেব বোধহয় তোমার পুজো নেবেন না। জানোই তো, বিয়েতে সম্মতি ছিল না ওঁর —'

তমসা বললেও বুঝতে অসুবিধে হয়নি আসলে এগুলো নীহারেরই কথা। অর্থও খুব পরিষ্কার। আগে যেভাবেই ভেবে থাকুন না কেন, ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তারপর আর এগোবার সাহস নেই তাঁর।

এর চেয়ে স্পষ্টভাবে নিজের জায়গা চেনা যায় না। বিয়ের আগে একদিন আমতলা থেকে ফিরতে ফিরতে যা বলেছিল দীপঙ্কর, আজকের কথাগুলো তার চেয়ে ভারী। অধিকার বলে তার সেদিন কিছুই ছিল না, আজ অধিকারটাই চলে যাচ্ছে।

তখন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার সময়। তবু, অপমানবোধের ভিতর শক্ত হলো গার্গী। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যেটুকু সময় লাগে তা নিয়ে বলল, 'আপসেট হবার কী আছে! গুরুদেবটা তোমার মায়ের, তোমাদের। আমার নয়। বাড়ির বউ বলে যা করতে বলেছিলে

তোমরা, তাতেই রাজি হয়েছিলাম। ঘেন্নাটা থেকে গিয়েছিল। এখন বেঁচে গেলাম।'

গার্গীর গলায় ঝাঁঝ ছিল। তমসাকে আরও বিব্রত দেখালো। পরে বলল, 'দাদা এখনো কিছু জানে না। জানলে কী বলবে জানি না।'

ঠোঁটে দাঁত চেপে চুপ করে থাকল গার্গী।

'তুমি দাদাকে একটু বুঝিয়ে বোলো।' তমসা বলল, 'ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোঁট পাকিয়ে গেল। এখন গুরুদেবকেও আসতে বারণ করা যায় না, শিষ্য শিষ্যাদের মুখে পাঁচকান হবে। আমি আগেই বলেছিলাম মা-কে—'

'আমি কোনো কথাই বলব না।' তমসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গার্গী বলল, 'তোমাদের বাড়ির ব্যাপারে আমি নাক গলাতে যাবো কেন! ওসব গুরুদেব ফুরুদেবে আমার ইন্টারেস্ট নেই।'

স্মৃতিতে আগে পরে নেই কোনো। সব ঘটনাই ভিড় করে আসছে একসঙ্গে। তবে তখনকার অনুভূতিগুলোকে ধরা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। ছ' সাত মাস হয়ে গেল, এখন বিশ্বাস হয় না এমন ঘটতে পারে, এইভাবেই ঘটেছিল সব! পর্দায় সচল বিভিন্ন দৃশ্যের মতো নিজের নির্বাক হাত পা মুখের নড়াচড়া দেখতে লাগল গার্গী।

কথার হেবফের হয়নি। দীপঙ্করকে বলেনি কিছু। ভেবেছিল যা জানাবার তা ও নিজেই জানবে, কোনো সিদ্ধান্ত নেবার থাকলে নিজেই নেবে। বস্তুত এই পরিস্থিতিতে দীপঙ্কর কী বলে না বলে তার কোনো দাম নেই তার কাছে। মনঃস্থির করে ফেলেছিল সে।

পরের দিন সকালেই দীপ্রকে নিয়ে চলে এলো বাপের বাড়িতে। তখনকার মানসিকতা একক হয়ে উঠেছিল নিজেকে নিয়ে, দীপঙ্করকেও জানায়নি কিছু। কোনো আবেগ নয়, অভিমানও নয়, বস্তুত একটা অন্ধতা তাড়া করছিল তাকে।

রাত্রে খোঁজ করতে এলো দীপঙ্কর। বিব্রত, অবিন্যস্ত; ওকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

এবার আর নতুন কোনো মোহে জড়াতে চায়নি গার্গী। বিয়ের আগে একরকম ছিল; বিয়ের পরে এই ক' বছরে শরীর বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে

মনটাও গেছে বদলে, যে-কোনো ঘটনাকেই এখন সে খুঁটিয়ে বুঝতে পারে। দীপঙ্কর তেমন করে কিছু বলবার আগেই বলল, 'আমার ভাবনা আমি ভেবে ফেলেছি। ওখানে আর ফিরব না।'

দীপঙ্কর অবাক হলো না। তবু হতভম্ব চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল স্ত্রীর দিকে। তারপর বলল, 'আমাকেও একটু ভাববার সময় দেবে তো!'

'নতুন আর কী ভাববে!' যতোই শক্ত হবার চেষ্টা করুক, গার্গী অনুভব করছিল জোর কমে আসছে, ক্রমশ দীপঙ্করের স্ত্রী হয়ে উঠছে সে। কী যেন একটা হচ্ছিল ভিতরে। সেটা সামলে থেমে থেমে বলল, 'তোমাকে তো আমি ছাড়তে পারব না। দীপ্ররও তোমাকে দরকার। যদি মনে করো এসব পেতে গেলে ও বাড়িতেই থাকতে হবে, তাহলে আমাকেই ছেড়ে দেবার কথা ভেবো।'

দীপঙ্করকে সচরাচর এতোটা গম্ভীর দেখায় না। সামান্য সময় নিয়ে বলল, 'আমি কী করব সেটা তোমাকে সাজেস্ট করতে হবে না। তোমার ডিসিসন তুমি নিয়েছ। আমারটা আমিই নেবো।'

দৃষ্টি দূরে, রাস্তায়; কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনায়াসে নিজেকে সেদিনের ঘটনায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারল গার্গী। দীপঙ্কর চলে যাচ্ছে, প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুত ওর হাঁটার ধরন—ভুল দরজায় কড়া নেড়ে যেভাবে দ্রুত হয়ে ওঠে অপ্রতিভ কেউ।

পিছন থেকে ওর চলে যাওয়া লক্ষ করতে করতে সংশয়ে ছেয়ে গিয়েছিল গার্গী। বুঝতে পারছিল না স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা শেষ কথাগুলো বলে ফেলল কি না।

তখন ভাবতে পারেনি তার আর দীপঙ্করের চিন্তা এক খাতে বইছে না; আগাগোড়া বাড়িমুখো আয়েসি মানুষটা নিজেই বেরিয়ে আসবে বাড়ি ছেড়ে; বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক না ছাড়লেও তাকে আর দীপ্রকে নিয়ে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেবে।

'কী ব্যাপার! আজ অফিস ছিল না?'

সুরমা। কোথাও যাবেন বলে নেমে এসেছেন, জানলায় গার্গীকে দেখে

থেমে দাঁড়ালেন।

নিঃশ্বাস সামলে হাসল গার্গী।

'ছিল। ছেলে বাড়িতে, পাহারা দিচ্ছি।'

'তাই তো! সকালেই দেখলাম দীপ্রকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছ। কমলা এলো না কেন?'

'ছেলের অসুখ—

'ওদের এই-ই ব্যাপার। একটা না একটা লেগেই আছে!' অভ্যাসে বলা কথা। দরজা ও গেটের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন সুরমা। বললেন, 'বৃষ্টিটা ধরল বলে মনে হচ্ছে। যাই, একবার গ্যাসের দোকানে যাবো। ওনাকে তিনদিন ধরে ঘোরাচ্ছে।'

আজ সারাদিন ধরে বেশ খেলা দেখাচ্ছে আকাশ। এই আঁধার, এই আলো, দুইয়ের কোনোটাই জমছে না হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টিতে। সেবার সিমলায় যেমন দেখেছিল। বিয়ের পর-পরই গিয়েছিল দীপঙ্করের সঙ্গে। সিমলায় এক বেলা; তারপর, ওখানে ঘিঞ্জি লাগায়, দীপঙ্কর টেনে নিয়ে গেল বেশ কয়েক মাইল দূরে, কুফরিতে। কাঁচ-বন্ধ গাড়িতে পাক দিয়ে দিয়ে ওপরে ওঠা। কী যেন ছিল হোটেলটার নাম, ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল? চারদিকে পাহাড় আর খাদের খাঁজ থেকে উঠে আসা বড়ো বড়ো গাছে ঘেরা সেই নির্জনতায় যখনতখন কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছিল ভাতের ধোঁয়ার মতো টগবগে কিন্তু ঠাণ্ডায় উপছানো মেঘ, পালা করে আকাশ কাড়ছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর রোদ্দুর। বড়ো হবার পর সেই প্রথম কোথাও দূরে গেল গার্গী। না, তুলনাটা ঠিক হলো না; কোথায় কুফরির স্বর্গ আর কোথায় কলকাতার এই অজ পাড়া! এখানে সৌন্দর্য নেই, এমন আকাশ শুধুই বিষণ্ণ করে দেয়। নাকি আবারও ভুল ভাবছে সে! তখন তারা অন্যরকম ছিল বলেই কুফরির একই বিষাদেও সৌন্দর্য পেয়েছিল!

শোবার ঘরে ফিরে এসে গার্গী দেখল বেঘোরে ঘুমুচ্ছে দীপ্র। মায়াময়. বড়ো নিশ্চিন্ত লাগছে ওকে। মুখে দীপঙ্করের আদল। ঘুম ভাঙার পরই হয়তো দুপুরে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়বে। যে করেই হোক, ছবিঅলা বইটা আজই ওকে কিনে দেওয়া দরকার।

গার্গীর নিজেরও ক্লান্তি লাগছিল, থেকে থেকে হাই উঠে আসছিল গলায়। এই অবেলায় ঘুমিয়ে লাভ নেই, তাতে গা ম্যাজ ম্যাজ করবে আরও। বরং আজ যখন বাড়িতেই আছে, দীপ্র আর দীপঙ্করের জন্যে কিছু খাবার-দাবার করে রাখতে পারে। অন্য রকম হতে পারে একটু। দীপ্রকে স্কুল থেকে আনবার সময়টাতেই কাজে আটকে পড়েছিল দীপঙ্কর, বাড়ি ফিরতে যে দেরি হবে এমন কোনো কথা বলেনি। যদি তাড়াতাড়ি ফেরে আর আবহাওয়া গোলমাল না করে, তাহলে সে ওকে বেরুবার জন্যে জোর করবে। যেখানে হোক। দীপ্র নৌকো দেখতে ভালোবাসে, আর ট্রেন, আর এয়ারোপ্লেন। দুটো ঘর আর এক চিলতে বারান্দার আবদ্ধতায় কেমন যেন দম-আটকানো লাগছে। নাকি, সেদিন যা হতে গিয়েও হলো না, দীপঙ্করকে বলবে দীপ্র অনেকদিন বালিগঞ্জ প্লেসে যায়নি, সুতরাং তারা একসঙ্গে যেতে পারে। কোন মেজাজে ফিরবে কে জানে! তবে এটা ঠিক, পার্ক সার্কাসের দিকে ওকে নড়ানো যাবে না।

রান্নাঘরে গিয়ে ময়দার টিনটা খুঁজে বের করল গার্গী। তরকারির ঝুড়ি টেনে কী আছে না আছে দেখল। তারপর ব্যস্ত হতে হতে ভাবল, দীপঙ্কর কি ভাবে সেদিন বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তে হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিংবা, গার্গী যদি সেদিন ওরকম না করত, আর একটু সহ্য করে শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিত, তাহলে ও নিজে অন্তত এই দুরবস্থায় পড়ত না!

হয়তো ভাবে। গার্গী ভাবল। কে জানে কেন, ওই ঘটনার পর থেকেই কেমন যেন বদলে গেছে ও, বদলে যাচ্ছে ; ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যায় প্রসঙ্গটা। কিন্তু অন্যভাবে, অন্য কথায়, এমনকি অকারণেও একটা বিক্ষোভ চাগিয়ে ওঠে মাঝেমধ্যে। কখনো কখনো মনে হয় আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে ওর, তাকে ও দীপ্রকে জড়িয়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বেঁচে থাকার বোধটাও- ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে দীপঙ্কর।

কিন্তু, এমন হবে কেন! দীপঙ্কর কি নিজের চোখেই দেখছে না, তাদের ফিরে যাবার ব্যাপারে ও-বাড়ি থেকে কোনো উৎসাহ না দেখালেও এই অবস্থার মধ্যেও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যতোটা সম্ভব সম্পর্ক রেখে চলেছে

গার্গী—নিজেই ঠেলে পাঠাতে চায় দীপঙ্করকে, ওর সঙ্কোচ দেখে ফোন করতে বলে, দীপঙ্কর বলুক না বলুক দীপ্রকে সঙ্গে নিয়ে এই ক'মাসে নিজেই ঘুরে এসেছে তিন চারবার। দিন দুয়েক নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে তমসাকে।

এর মধ্যে একদিন ইউনির্ভাসিটি থেকে ফেরার সময় তার অফিসে এসেছিল তমসা। এক সেট জামা প্যান্ট দিয়ে গেল দীপ্রর জন্যে। গার্গী তৈরি ছিল না। নন্দিতার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে ফ্লুরিজে চা খাওয়াতে নিয়ে গেল ওকে।

এ-কথা সে-কথার পর তমসা হঠাৎ বলল, 'বৌদি, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাইছ?'

জবাব দিতে সময় নিল গার্গী। অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। পরে বলল, 'আমি না হয় পর। তোর বাবা-মা তোর দাদার কথা ভাবেন না কেন! ও তো গোঁ ধরে বসে আছে। ওকে বোঝাতে পারতেন আলাদা থাকলেও কাজের জায়গা থেকে আলাদা হবার কোনো দরকার ছিল না!'

তমসা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ফিরে আসতে চাইছ?'

'না। ফিরলে সেই একই ব্যাপার হবে। ছ' বছর তো দেখলাম! আসলে তোর দাদাকে দেখে কষ্ট হয়। ওর জীবনটা তো এমন হবার কথা ছিল না!'

চোখ নামিয়ে কথা বললেও গার্গী বুঝতে পারছিল তমসার দৃষ্টি তার সিঁথিতে নিবদ্ধ। চারদিন পরে আজ সে সিঁদুর পরেছে। কাল রাতে দীপঙ্করের শরীরে ঘন হতে হতে টের পেয়েছিল সময়ের আগেই ক্ষয়ে যাচ্ছে দীপঙ্কর। নিঃশ্বাসে পোড়া সিগারেটের গন্ধ।

'দাদাও এইসব বলে নাকি?'

'বললে তো বোঝা যেত।' গার্গী মুখ তুলল, 'কিছুই বলে না। কিন্তু মনে মনে ভাবে হয়তো।'

ক' মুহূর্ত চুপ করে থাকল তমসা। তারপর বলল, 'দাদা যা করেছে ঠিকই করেছে। তুমিও ঠিকই করেছ। একটা স্ট্যান্ড নেবার দরকার ছিল, বৌদি। তুমি দাদার সুখের দিকটা দেখছ, সম্মানের দিকটা দেখছ না। এই

করতে করতে যদি দাঁড়িয়ে যায়, মন্দ কি ! ত্যাজ্যপুত্রও তো হয়নি ।'

'সবাই সবকিছু পারে না। তা ছাড়া— ।'নিজেকে গোছাতে গিয়ে ছড়িয়ে ফেলছিল গার্গী । বলার কথাটা সরিয়ে ফেলে বলল, 'আমার ভয় করছে। আমার জন্যেই এসব হলো !'

কাঁটা দিয়ে প্লেটের ওপর আধ-খাওয়া পেস্ট্রি ভাঙছিল তমসা ।সম্ভবত ও-ও গুলিয়ে ফেলছে নিজেকে । এখন মুখোমুখি, মাঝখানে টেবিল, কথা থামলেই ফিরে আসছে দূরত্ব । ছাদের কার্নিশ ছুঁয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এক সময় ওরা কনুইয়ের রঙ মেলাতো ।

তমসা সহানুভূতি দেখালো না । গলার স্বরে রাগ মিশিয়ে বলল, 'আর কিছু না পারো, দেমাকের বেলুনটা ফাটিয়ে দিয়েছ । দাদা একা পারত না, কোনোদিনই পারত না । ভাবতে পারো, আমাদের বাড়ির মতো বাড়িও আছে কলকাতায় ! বাবা চলছে টাকার জোরে, মা গুরুদেবের জোরে । নিজেদের কিছু নেই । এখন লজ্জায় গুটিয়ে আছে—'

গার্গী চুপ করে থাকল । তমসা নিজের দাদাকে চেনে, তার স্বামীকে চেনে না । সব কথা কি আর খুলে বলা যায় ! বললে বুঝতে পারত সে কেন ভয় পাচ্ছে ।

'তোমরা ফিরে এলে ভালো হতো, বৌদি ।' পরের কথাটার জন্যে অপেক্ষা করে তমসা বলল, 'তবে নিজে থেকে ফিরো না । দাদা নিজেরটা নিজেই বুঝে নেবে ।'

তমসা মেয়েই । সুতরাং গলার ভারে চোখও ভরে উঠল । মুখ জুড়ে থমকে আছে লাবণ্য, এখন দেখলে মনে হয় না গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখলে ও নিজেও ঝোড়ো হয়ে ওঠে ।

অবস্থা বুঝে তাড়াহুড়ো করে ওর দেওয়া প্যাকেটটা খুলে দীপ্রর জামা প্যান্ট নাড়াচাড়া করতে করতে গার্গী বলেছিল, 'চমৎকার মানাবে দীপ্রকে । পিসি দিয়েছে শুনলে লাফাবে । ওর হাতে দিলেই পারতিস !'

'তাই দেবো ভেবেছিলাম । কিন্তু তোমরা কখন বাড়িতে থাকো না থাকো—'

বেল পড়ল দরজায় । হ্যাঁ, তাদেরই দরজায় । গ্যাস বন্ধ করে চুল্লি

থেকে কড়াইটা নামিয়ে রাখল গার্গী। আঁচলে হাত মুছে দরজা খুলতে এলো।

সময় আন্দাজ করে ভেবেছিল টগরের মা, দুপুরের বাসন ধুতে এসেছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, দীপঙ্কর।

গার্গী হাসছিল।

'এতো তাড়াতাড়ি! কাজ হয়ে গেল?'

'আর কাজ!' দীপঙ্কর হাসল না। স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল, 'গেরো লেগেছে কপালে।'

'সে আবার কি!'

জবাব পেল না। সোফায় বসে দীপঙ্কর এখন মাথা ঝুঁকিয়ে জুতোর ফিতে খুলতে ব্যস্ত। গার্গী বুঝতে পারল না দরজাটা লাগিয়ে দেবে কি না।

'দীপ্র কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছে—'

দীপঙ্করের আগ্রহ ওখানেই শেষ হলো।

নিজের জায়গা থেকে স্বামীকে লক্ষ করছিল গার্গী। টান করে আঁচড়ানো চুলের ফাটলে চাঁদি দেখা যাচ্ছে, রেখা পড়েছে কপালে। বৃষ্টিতে ভিজেছে, নাকি ঘামে; সার্টের ভিজে কাঁধের তলা থেকে ফুটে উঠেছে স্যাণ্ডো গেঞ্জির হাতা। জুতো খুলতে খুলতে তাকিয়ে থাকল জানলার দিকে।

গার্গী অপ্রতিভ বোধ করল। এতোক্ষণ সে উল্টো রাস্তায় হাঁটছিল। তবু বলল, 'অমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন! কী হয়েছে বলবে তো!'

'কী আর হবে! ঘুস চায়। না হলে নড়বে না।'

জুতো জোড়া হাতে নিয়ে পর্দা সরিয়ে ভিতরে চলে গেল দীপঙ্কর। বিরক্ত। সম্ভবত এবার বিছানায় ছুঁড়ে দেবে নিজেকে।

গার্গী দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। দেখল টগরের মা আসছে। তখন ভাবল, ও কাজ সেরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দীপঙ্করকে কিছু বলা যাবে না।

কাছে এসে টগরের মা বলল, 'কমলা কাল আসবে না, বৌদি। খবর দিয়েছে।'

গার্গী জবাব দিল না। ওকে পাশ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। দীপঙ্করের হতাশা যেন ওকেও অধিকার করে নিচ্ছে।

৩

তিন মাস পরে একদিন সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আশঙ্কায় কেঁপে উঠল গার্গী। যতোটা আগ্রহ নিয়ে, বস্তুত উৎকণ্ঠা নিয়ে, ছুটে এসেছিল, নিমেষে অন্তর্হিত হলো তা। পরিবর্তে এক ধরনের অনুভূতিহীনতায় আড়ষ্ট লাগল নিজেকে।

সুরমাদের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজায় একটা তারের জাল-দেওয়া বাল্‌ব্‌ জ্বলে। বহুদিন একইভাবে আলো দিতে দিতে মলিন হয়েছে কিছুটা, তাদের দরজা অব্দি পৌঁছুবার আগেই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কোনো কারণে আলোটা না জ্বললে অসুবিধে হয় আরও। আশপাশ দেখা যায় না ভালো করে ; জ্যোৎস্নার আলোতেও কেমন যেন ভুতুড়ে লাগে। এ বাড়িতে আসবার পর ব্যাপারটা লক্ষ করে ওরা ভেবেছিল বাড়িঅলা গোপালবাবুকে বলবে তাদের দিকেও একটা আলোর ব্যবস্থা করে দিতে, যাতে রাতবিরেতে দরকার হলে জ্বালতে পারে। বলবে বলবে করেও বলা হয়ে ওঠেনি। তার বদলে সন্ধের পর কারও ফিরতে দেরি হলে বা কারও আসবার কথা থাকলে বসবার ঘরের আলোটা জ্বেলে রাখত ওরা, যাতে জানলার মধ্যে দিয়ে অন্তত কিছু আলো এসে পড়ে বাইরে। দরকার অবশ্য হয়নি তেমন। তার দেরি করে ফেরার প্রশ্ন ওঠে না, দীপঙ্করের দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলে ছোট টর্চটা নিয়ে যায় সঙ্গে। বাইরের লোক কে আর আসছে ! বালিগঞ্জ প্লেসে থাকতে প্রায়ই সন্ধের পরে বেরুত ওরা ; নাইট শোয়ে সিনেমা দেখা বা দীপঙ্করের কোনো বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, সপ্তাহে এক দুদিন লেগেই থাকত। দীপঙ্কর গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করায় যাতায়াতে অসুবিধে ছিল না। ঠাকুমা বা পিসির কাছে দিব্যি থাকত দীপ্র। এখানে আসার পর সে-পাট উঠে গেছে। দীপ্রকে আগলানো, যাতায়াতের ঝামেলা, কাজ—এগুলো সামলে বেরুবার সময়

কোথায় ! ক্লান্তও লাগত। তার চেয়ে বড়ো কথা, আগের সেই মনটাই যেন হারিয়ে গিয়েছিল। দুজনেরই। অন্তত দীপঙ্করকে দেখে মনে হতো উৎসাহ নেই, ইচ্ছে করেই বন্ধুবান্ধব, বাইরের জগতের সম্পর্কগুলো এড়িয়ে চলতে চাইছে ও।

এই মুহূর্তে দরজা বন্ধ দেখেই যে অাড়ষ্ট বোধ করল তা নয়। হতাশার কারণ বসবার ঘরের জানলা বন্ধ দেখে. বাতাস ঢোকার জন্যে খড়খড়ি তোলা আছে, কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলার চিহ্ন নেই। তার মানে বাড়িতেও কেউ নেই।

তিনদিন একটানা বৃষ্টির পরে আজ আকাশ পরিষ্কার হলেও আলো ফোটেনি। সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষ চলছে এখন। মেঘ আছে কি না বোঝা যায় না। মন্থর এক ধরনের হাওয়া স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছিল মাঝে-মাঝে।

দরজার সামনে থেকে একটু সরে এসে অপরিচ্ছন্ন আলোয় কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল গার্গী। সাতটা দশ।

এই যে দেখা, এটার অবশ্য দরকার ছিল না কোনো। বাস থেকে নামবার সময়েই দেখেছিল সাতটা বেজে গেছে। উৎকণ্ঠার শুরু তারও আগে। তবে এমন হবে ভাবেনি।

ব্যাগ হাতড়ে দরজার চাবিটা বের করল সে। ভিতরে ঢুকে সুইচ খুঁজে আলো জ্বালল। আলোকিত এই দৃশ্যের সঙ্গে অন্ধকারের তফাত বোঝা যায় না, মনে হচ্ছে অন্ধকার সঙ্গে নিয়েই এসেছে। দরজাটা বন্ধ করবে ভেবেও করল না। তারপর পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে বারান্দা ও শোবার ঘর ঘুরে আবার ফিরে এসে দরজার কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

সামনে তাকালে যা যা দেখা যায় তার কিছুই অপরিচিত নয়, তবু অসম্পূর্ণ লাগছে কেমন। এখনই খেয়াল করল আসবার তাড়ায় গেটটা লাগায়নি ভালো করে। গেটের দুদিকে পাঁচিল ঘেঁসে গাঁদা ও দোপাটির চারা লাগিয়েছিলেন গোপালবাবু, ভরা বর্ষার বৃষ্টি পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে গাছগুলো, ফুলও ধরেছে। ডানদিকের রাস্তায় একটি রিক্সা চলে যাবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উল্টোদিক থেকে এগিয়ে এলো একটা ট্যাক্সি, তার পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স। তার পরের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে

নিঃশ্বাস চাপল গার্গী এবং ভাবল, কোথায় কী হচ্ছে সে যেমন দেখতে প্যাচ্ছে না, তেমনি তাকেও কেউ দেখছে না।

দীপঙ্কর বলেছিল ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে আসবে। এতো বাঁধাধরা সময় মেনে চলতে অভ্যস্ত নয় গার্গী, তাছাড়া স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দেখা করবে, নিজেদেরই বাড়িতে, এর মধ্যে এতো সময়ের মাপজোখ আসে কী করে !

দুপুর থেকে তিন বারের চেষ্টায় পেয়েছিল ওকে। ওদের অফিসে, টেলিফোনে। গার্গী বলল, 'সময় বেঁধে দিচ্ছ কেন ! তুমি তো তার পরেও থাকবে বাড়িতে—'

'না। সেটাই প্রব্লেম।' দীপঙ্কর বলল, 'সাড়ে সাতটায় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, চৌরঙ্গিতে। পৌনে সাতটা, সাতটার মধ্যে না বেরুলে পৌঁছুতে পারব না। আমি গাড়ি নিয়েই আসবো।'

এ বড়ো অস্বস্তিকর। গার্গী দেখল তখনই পাঁচটা। এর পর অফিস থেকে বেরিয়ে পার্ক সার্কাসের বাড়ি ঘুরে দীপ্রকে নিয়ে দীপঙ্করের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ওখানে পৌঁছুনো সত্যিই এক ঝকমারি। দীপঙ্করকে কি বলা যাবে তার সমস্যার কথা !

গার্গী বুঝতে পারছিল না কেন এমন অস্বস্তি ! ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রে ফিরবে কখন ?'

'রাত্রে ! কেন ?'

'আজ ওখানেই থাকব। ছেলেটাও ঘ্যানঘ্যান করছে। এভাবে ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকতে কার ভালো লাগে।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না দীপঙ্কর। ওদিক থেকে ওর গলার কাশির শব্দ পাচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, 'ছেলের তো কোনো দোষ নেই। আমি কি ছাড়া-ছাড়া থাকতে বলেছিলাম !'

আবার সেই পুরনো কাসুন্দি। যেন দীপঙ্কর ফিরতে চাইছে সেই জায়গায়, যেখান থেকে গার্গীর চাকরি না-ছাড়ার জেদটাকেই সব নষ্টের গোড়া হিসেবে চেনা যায়।

মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও গার্গী সংবরণ করল নিজেকে।

আজকাল এমন হয়েছে যে উত্তেজনা এসে যায় সামান্য কথায়, সেটা প্রশমিত করতে চাপা একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে। সাবলীলতা খুঁজে পায় না মন-মেজাজের।

'আমি কি দোষগুণের কথা বলল'ম !' উত্তাপ এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় গার্গী বলল. 'রাত্রে কখন আসবে বলো ' আমি না হয় সেই বুঝেই যাবো .'

'সেটা একটু আনসার্টেন।'

'কেন ! ফিরবে না ?'

'ফেরা না ফেরার কথা হচ্ছে না। দেরি হতে পারে, সেটাই বললাম।' কথাগুলো বলে থামল দীপঙ্কর ; গলার স্বরে সামান্য পরিবর্তন এনে বলল, 'তুমি ছেলেকে নিয়ে এসে একটা দুশ্চিন্তায় থাকবে, সেটা কি ভালো হবে !'

গার্গী ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। স্বামীর ফিরতে দেরি হলে স্ত্রী অপেক্ষা করে, জেগে থাকে, বিয়ের পর থেকে তাদের জীবনেও—যেখানেই থাকুক না কেন,এমন ঘটনা নতুন নয়। এর মধ্যে ভালোমন্দের প্রশ্ন উঠছে কেন !

অধৈর্য হয়ে গার্গী বলল, 'ঠিক আছে। আমি সন্ধের সময়েই যাবো। তারপর থাকব কি না দেখা যাবে।'

ফোন ছেড়ে দেবার পরেও অনিশ্চয়তা গেল না। ফোনটা সে-ই করেছিল ; শুধু আজ বলে নয়—গতকাল এবং তার আগের দিনও, দীপঙ্করের তরফে কোনো উদ্যম দেখা যায়নি। দীপঙ্করের কি বোঝা উচিত নয় আর্তি, আন্তরিকতা না থাকলে কেউই এভাবে উপযাচক হয় না। এখন তো আবার ও ফিরে গেছে পারিবারিক ব্যবসায়—অফিস, টেলিফোন সবই নাগালের মধ্যে, গার্গীর ফোনের অপেক্ষা না করে এই তিনদিনের মধ্যে দীপঙ্কর নিজেও তো একবার তার অফিসে ফোন করতে পারত, অন্তত জিজ্ঞেস করতে পারত ছেলেটা কেমন আছে ! ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকার কথাটা দীপ্রর সূত্রে বললেও, বস্তুত নিজেকেই ব্যক্ত করেছিল গার্গী। এবং অকারণে নয়। কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছে এতোদিনের অভ্যস্ত অভিজ্ঞতা থেকে কী যেন সরে গেছে, একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে কোথাও, সেখানে সারাক্ষণ খলবল করছে অতৃপ্তি আর অশান্তি। ভাবতে পারেনি তার স্বামী

ভুল বুঝবে তাকে, বা কথাটা এমনভাবে ঘোরাবে যাতে সে আর অনুভূতির গাঢ়তায় ফিরতে না পারে।

বিষণ্ণতা সত্ত্বেও নিজেকে স্থির রাখবার চেষ্টা করল গার্গী। যে বুঝতে চাইছে না তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে লাভ কি! পরে ভাবল, এমনও কি হতে পারে যে, দূরত্ব থেকে, সান্নিধ্যের অভাবে সে নিজে যেমন অস্থির ও অসংলগ্ন বোধ করছে, রাগও এসে যাচ্ছে কখনো কখনো, তেমনি একই ধরনের অস্থিরতায় জড়িয়ে পড়েছে দীপঙ্করও, নিজস্ব অনুভবের বাইরে আর কিছুই তার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে না। হতে পারে। কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানতে চাইলেও যেতে হবে ওরই কাছে।

হাতে ঘণ্টা দেড়েকেরও কম সময়। এর মধ্যে পার্ক সার্কাসের বাড়িতে যাওয়া, দীপ্রকে তৈরি করা এবং নিজের বাড়ির দিকে রওনা হওয়া, সবটাই সময়সাপেক্ষ। এখন অফিস ছুটির সময়, ট্রাম বাস মিনিবাস সবই গাদাগাদি হয়ে থাকবে ভিড়ে। একটা শিশুকে সঙ্গে নিয়ে এতো অল্প সময়ের মধ্যে সে পৌঁছুবে কী করে! যেটা আরও খারাপ লাগছিল, দীপঙ্কর নিজের তাড়াটা বোঝালো, বলল চৌরঙ্গিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবার জন্যে সে গাড়ি নিয়েই আসবে। না হয় নিজের গোঁ বজায় রাখবার জন্যে পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এলো না, কিন্তু ও কি বলতে পারত না তোমার অতো তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে কিংবা গড়িয়াহাটে দাঁড়াও, আমি তোমাদের তুলে নেবো! ওদের লোয়ার সার্কুলার রোডের অফিস থেকে এই জায়গাগুলো কী আর এমন দূরে! নাকি ও ডুবে ছিল এমনই কোনো চিন্তায় যা সম্পর্কের ভিতরের চেনা জায়গাগুলোকেও সম্পূর্ণ অচেনা করে দেয়!

তাই দিক। গার্গী ভাবল, সেও দেখবে। শেষ পর্যন্ত দেখবে।

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে পৌঁছে মন খারাপ বাড়ল। আজ সকালে স্কুলে যাবার আগে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছিল দীপ্র। যাবার ইচ্ছে নেই, বাবার কাছে যাবে বলে বায়না ধরল, তারপর নিজেদের বাড়িতে ফেরা নিয়ে। এমনকি কমলা কেন আসছে না তা নিয়েও হাত-পা ছুঁড়ল খানিক। বিরক্ত বোধ করলেও গার্গীর মনে হচ্ছিল নিজের মতো করে তারই মানসিক

টানাপোড়েনের বৃত্তান্ত বর্ণনা করে যাচ্ছে দীপ্র। শেষ পর্যন্ত স্কুলে পৌঁছে দিতে পারলেও তখন ধরতে পারেনি ভিতরে জ্বর পুষে রেখেছে ছেলেটা, এসব ঘ্যানঘ্যানানি শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই। বাড়িতে পৌঁছে শুনল স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে ফিরেছে ও। যা খেয়েছিল সব বমি করে ফেলেছে। আজ প্রমোদ আনতে গিয়েছিলেন ওকে. গায়ে গলায় কপালে হাত দিয়ে রীতিমতো তাপ আছে অনুভব করে কল দিয়েছিলেন পাড়ার ডাক্তারকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। পরশু স্কুল থেকে ফেরার সময় হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়েছিল, ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া অসম্ভব নয়। সারা দুপুর পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন সুবর্ণা। স্কুলের চাকরি সেরে বাড়ি ফেরার পর থেকে সুমিত্রাই সামলাচ্ছে ওকে।

এই অবস্থায় দীপ্রকে নিয়ে বেরুনো যায় না।

গার্গী স্থির করতে পারছিল না সে নিজেও বেরুবে কি না। এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার—তার এবং দীপঙ্করের, নিতান্তই বাপের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সমস্যা নয় যে প্রমোদ বা সুবর্ণার সঙ্গে আলোচনা করবে। তাছাড়া, সে-ই আসতে বলেছে দীপঙ্করকে, না গেলে খারাপ দেখাবে, ওর পক্ষে রেগে যাওয়াও অসম্ভব নয়—একটা ব্যস্ততার মধ্যে আছে জেনেও গার্গী শুধু শুধু তাকে হয়রান করল কেন! প্রশ্নটা খারাপ দেখানো বা ভালো দেখানো নিয়েও নয়, সম্পর্কের, হয়তো বা সম্পর্কের সঙ্কটেরও। বাস্তবিক, সে নিজেই তো উচাটন হয়ে আছে তিন চারদিন দেখা না হওয়ায়। দেখা তাকে করতেই হবে। অবশ্য আজ যে ভাবছিল ওখানেই রাত কাটাবে, কাল সকালে ওখান থেকেই ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে অফিসে যাবে সে, দীপ্র হঠাৎ জ্বর বাঁধিয়ে বসায় সেটা আর হবে না। বরং সুযোগ পেলে দীপঙ্করকে বলতে পারে, তার জন্যে না হোক, অসুস্থ ছেলেকে দেখবার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরে সে একবার আসতে পারে পার্ক সার্কাসে। সকালে বেশ কয়েকবার বাবা-বাবা করেছিল দীপ্র। এমনও হতে পারে, শরীরে জ্বর থাকার জন্যেই সকালে বায়না করেনি ও; দুশ্চিন্তা আগেই ছিল, ভিতরেব অভিমান ক্রমশ পরিণত হয়েছে জ্বরে। ওইটুকু ছেলের মন কে আর ষোলআনা বুঝছে!

সময় চলে যাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তকেই এখন মনে হচ্ছে জরুরি। দীপ্র জ্বরে পড়বে এটা সে জানত না ; জানবার পরে দীপঙ্করকেও যে জানাবে এবং বলবে সে যেতে পারছে না—পারলে দীপঙ্করই চলে আসুক, বা, যা ইচ্ছে করুক, সেটাও সম্ভব নয় এখন। তাড়া দীপঙ্করের। ছ'টা নাগাদ পৌঁছুতে চাইলে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে এতোক্ষণে। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে বেরোয়নি এখনো, তাহলেও, জানাবে যে, কোত্থেকে জানাবে ! পাড়াটা গলির মধ্যে, কাছেপিঠে তার জানা এমন কোনো জায়গা নেই যেখান থেকে ফোন করা যেতে পারে। এমন দোটানায়, সময়ের বিরুদ্ধে দৌড়নোর এমন প্রতিযোগিতায় গার্গী আগে পড়েনি।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল, যাবেই। দেখা করা এবং ফিরে আসা—সব মিলিয়ে দেড়, দু ঘণ্টা, এই সময়টা যাদের কাছে আছে তারাই দেখবে দীপ্রকে। এমনিতেই অফিস থেকে ফিরতে তার আরও দেরি হতে পারত।

শিখা চা করতে গিয়েছিল। ভেবেচিন্তে রান্নাঘরে গিয়ে ওকেই ধরল গার্গী। দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ও-বাড়িতে, ঘণ্টাখানেক কি দেড়ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে, এর বেশি কিছু বলল না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শিখা হয়তো অনুমান করল কিছু। প্রশ্ন করল না। চৌত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ বিধবা হবার পর ওর একদা-উচ্ছল স্বভাবে যেসব পরিবর্তন আয়ত্ব করে নিয়েছে শিখা, প্রশ্নহীনতা তার একটি। শুধু বলল, 'অফিস থেকে ফিরলে, চা-টা খেয়ে যাও অন্তত !'

'না, বৌদি। দেরি হয়ে যাবে।' ব্যস্তভাবে বলল গার্গী, 'কেউ জিজ্ঞেস করলে যা বললাম বোলো। দীপ্র যেন না জানে কোথায় গেছি।'

আর দাঁড়ায়নি। বাড়ির দরজা পেরিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল রাস্তায়। সে জানে তার ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। যতোই তাড়া থাক, তাকে লিফ্‌ট দিয়ে এতোটা রাস্তা নিশ্চিন্তে পার করে দেবার জন্যে কেউই এগিয়ে আসবে না।

তখন সময় ছিল না। এখন, নিজের বাড়িতে, দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, গার্গী অনুভব করল সে ঢুকে পড়েছে অনন্ত সময়ে—যেখানে উদ্বেগ, ব্যস্ততা, কারুর কথা ভেবে ছুটে আসা, কিছুই জরুরি নয়। কিংবা,

সবই অর্থহীন। খানিক আগে সে কি ভেবেছিল সম্পর্কের সঙ্কটের কথা? সঙ্কট কোথায়? সম্পর্কটাই তো খুঁজে পাচ্ছে না। এখন অনুভূতি বলতে শুধুই একাকিত্বের, যে-সময় চলে গেছে এবং যে-সময় আসছে, দুইয়ের মাঝখানে চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে থাকার। একা এসেছিল, একাই ফিরে যাবে।

বিকল্প কোনো চিন্তা মাথায় আসছিল না। ছেলে সঙ্গে থাকলেও কথা ছিল, দরকার হলে রাতটাও কাটিয়ে যেতে পারত এখানে। টেলিফোনে দীপঙ্করের কথা শুনে মনে হলো ও বাড়িতেই ফিরবে, তবে কখন ফিরবে সেটা অনিশ্চিত। তাতে কিছু যায় আসে না ; না হয় অপেক্ষা করত সে। কিন্তু, এখনকার সমস্যা অন্য। দীপ্র এক জায়গায়, সে এখানে, দীপঙ্কর কোথায় তা জানে না। কতোক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে! শিখাকে বলে এসেছে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরবে, তারও বেশিটাই চলে গেছে ইতিমধ্যে, দেরি হলে অযথা উদ্বেগ বাড়বে ওদের। তা ছাড়া, স্বামীর প্রতি দায়িত্ব দেখাতে গিয়ে সে কি ছেলের প্রতি দায়িত্বহীন হয়ে পড়ছে না! দায়িত্ববোধটা তো দীপঙ্করও দেখাতে পারত। যার সাতটায় বেরুলেও চলত, স্ত্রী আসবে—এবং গাড়ি কি ঘোড়ায় চড়ে নয়, আসবে ট্রামে-বাসে—জেনেও কি সে আরও দু-দশ মিনিট দেখে যেতে পারত না! সঙ্গে গাড়ি ছিল, না হয় ওর সঙ্গেই ফিরে যেত গার্গী, নেমে পড়ত মাঝপথে। কী এমন অ্যাপয়েন্টমেন্ট তোমার যে একটু দেরি হলে মহাভারত অশুদ্ধ হতো! নাকি স্ত্রীকে দেওয়া সময়টাকেও তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ধরে নিয়েছ—এর মধ্যে মায়া-দয়া, আলাদা করে বিবেচনার কিছু ছিল না, সময়টা পার করেই চলে গেছ! তাহলে তোমার সঙ্গে অফিসের সোমেশ্বরের তফাত কোথায়! নাকি পায়ের তলায় জমি খুঁজে পেয়ে ভাবতে শুরু করেছ এরকম বসিং চলে!

একটা অপমানবোধ ধীরে ধীরে তাপ ছড়াচ্ছিল মাথায়। দীপঙ্কর কি ইচ্ছে করেই এই অবস্থার মধ্যে রেখে গেল তাকে?

একা বাড়ির শূন্য সংস্পর্শে এভাবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই কোনো। গার্গী ঠিক করল, এখনই চলে যাবে। একটা চিরকুট লিখে যেতে পারে। যখনই ফিরুক, দীপঙ্কর দেখবে। দীপ্রর জ্বর জানিয়ে লিখতে পারে নিজের

স্ত্রী, সন্তানের জন্যে যে দশটা বাড়তি মিনিটও অপেক্ষা করতে পারে না সে কেমন মানুষ !

অভিমান থেকেই সন্দেহ এলো। এতো যে ভেবে যাচ্ছে তার মধ্যে সত্য কতোটুকু ? এমনকি হতে পারে যে শেষ পর্যন্ত আসেইনি দীপঙ্কর, আটকে পড়েছে কোথাও ? এলে, যেহেতু অপেক্ষা করার সময় নেই এবং চলে যেতে হচ্ছে, সে-ক্ষেত্রে ও নিজেও কি একটা চিরকুট লিখে যেত না !

পূর্বাপর হারিয়ে যাচ্ছে। খানিক অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে গার্গী ঠিক করল দোতলায় যাবে। সুরমাকে জিজ্ঞেস করবে। দীপঙ্কর এসে থাকলে সুরমারা জানতে পারেন, ওঁদের কাছে কোনো খবরও রেখে গেছে হয়তো। যদি না এসে থাকে, তাহলে চিরকুট না লিখে, যা বলবার সুরমাকেই বলে যেতে পারে।

সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখবার জন্যে আরও একবার ভিতরে ঢুকল ও। বাথরুমে গেল ; চোখেমুখে জল দিয়ে তোয়ালেয় চেপে চেপে মুখ মুছল। শিখার কথা শুনে তখন চা-টা খেয়ে এলেও পারত। কেন যে ভেবেছিল দীপঙ্কর চা খেতে চাইবে, ওর জন্যে চা করে দুজনেই খাবে একসঙ্গে ! রান্নাঘরের জানলার ছিটকিনিটা আলগা হয়ে আছে, সেটা ঠিকঠাক লাগাতে লাগাতে ভাবল, আজ দিনটাই খারাপ। সকাল থেকে একটি মুহূর্তও কাটেনি যার মধ্যে স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক বোধ করেছে সে। না, কাটেনি।

শোবার ঘরে গিয়ে দেখল বিছানাটা ধামসানো। মনে হচ্ছে কাল রাতে বেডকভার না তুলেই শুয়ে পড়েছিল দীপঙ্কর। সকালেও পরিপাটি করে রাখার কথা খেয়াল করেনি। বেডকভারটা তুলে, ঝেড়ে নিয়ে, আবার বিছিয়ে দিতে দিতে গার্গী ভাবল, না, তা কেন হবে !

তুমুল বৃষ্টিতে কাল জলে ভাসছিল কলকাতা। বিকেলের দিকে বৃষ্টির বেগ কমে আসছে দেখে দীপঙ্করকে ফোন করেছিল সে। দীপঙ্কর পরামর্শ দিল তাড়াতাড়ি পার্ক সার্কাসে ফিরে যেতে, ওয়েদার ফোরকাস্টে নাকি বলেছে সন্ধের দিকে বৃষ্টি আরও বাড়বে। তারপর, গার্গীকে কিছুটা অবাক করেই বলল, 'আমিও ভাবছি আজ বাড়িমুখো হবো না। ব্রীজের

নীচে তো সাংঘাতিক জল জমে। একটু আগে বাবা বলল আজকের দিনটা বালিগঞ্জ প্লেসে থেকে যেতে—মানে-- ।' বলতে বলতে থেমে গেল দীপঙ্কর।

ও থামল বলে গার্গীকেও থামতে হলো। সামান্য সময় নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ভেবেছিল, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই। ওর বাবা যদি আবার ওকে ব্যবসায় টেনে নিতে পেরে থাকেন, তাহলে বাড়িতেও টানবেন। হয়তো আজকের বৃষ্টিও সেই উপলক্ষ তৈরি করে দিল। এটা হতেই পারে। সে নিজেও তো চেয়েছিল আলাদা থেকেও স্বাভাবিক হোক ওদের পারিবারিক সম্পর্ক, তাতে আবার আগের মতো হয়ে উঠবে দীপঙ্কর। তমসাকেও বলেছিল একদিন। বাপ-ছেলের সম্পর্কে সে নাক গলাবে কেন!

এভাবে ভাবলেও হঠাৎই বিষণ্ণ বোধ করল সে। ফোন ছাড়ার আগে বলেছিল, 'সেই ভালো।'

তাহলে কাল নয়, পরশু রাতেই এই বিছানায় শেষ শুয়েছিল দীপঙ্কর। বৃষ্টির জন্যে পরশু থেকে ওরাও আটকে আছে পার্ক সার্কাসে। দীপঙ্কর কি আজ বালিগঞ্জ প্লেস থেকেই অফিসে গিয়েছিল? হবে হয়তো। ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

ঘরের আলো নিবিয়ে দরজা টেনে বাইরে এলো গার্গী।

আলো জ্বলছে দোতলায়, শোবার ঘর এবং বারান্দা দুটোই আলোকিত, মনে হয় গোপালবাবুও আছেন বাড়িতে। সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বেল দেবার আগে অস্বস্তি ছেঁকে ধরল তাকে, স্বামীর খবর নিতে স্ত্রীকে অন্যের দরজায় যেতে হবে কেন! ওঁরা কি ভাববেন যতো সহজে দীপঙ্কর সম্পর্কে প্রশ্ন করছে গার্গী, ঘটনা ততো সহজ নয়! কোনো সন্দেহ করবেন কি? কমলা চলে যাবার পর একদিন রাতে, মনে পড়ল, সে সময়টায় দীপ্র, অফিস আর সংসার সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে সে, মন কষাকষি থেকে বিছানাতেই ঝগড়া শুরু হলো তাদের। তারপর, যা কখনো হয়নি, দীপঙ্কর গলা চড়াতে সেও ধৈর্য হারালো, রাগের মাথায় দীপঙ্কর বলল ডিভোর্স করবে, গার্গী বলেছিল, 'হ্যাঁ, তা-ই করো। আমারও আর

ভালো লাগছে না—', ইত্যাদি। দুজনের কেউই খেয়াল করেনি এসব কথা নৈঃশব্দ্য চিরে দোতলা পর্যন্ত ছুটে যেতে পারে। তার ওপর মাঝে মাঝে দীপ্রর ভয়-পাওয়া গলায় আঁতকে ওঠা। পরের দিন অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল সব। কিন্তু, বিকেলে, গেটের কাছে মুখোমুখি দেখা হতে সুরমা বললেন, 'কাল তোমরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলে— ।' আর কীভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখানো যায়! লজ্জায় কথা ফোটেনি গার্গীর মুখে।

দরজা খুলল বাচ্চা কাজের মেয়েটি। সিঁড়ির বাঁকে সুরমাও এসে দাঁড়িয়েছেন।

'ও, তুমি! এসো, এসো—'

'আপনাদের বিরক্ত করলাম।'

'না, এসো।' গার্গী দু তিন ধাপ উঠে আসতে পিছন ফিরে এগোতে এগোতে সুরমা বললেন, 'বিরক্ত হবো কেন!'

বসবার জায়গায় ওকে বসিয়ে নিজেও বসলেন সুরমা। ওকেই দেখছেন।

গার্গী চোখ নামিয়ে নিল।

'মাসীমা, ও কি এসেছিল? মানে—'

গার্গী হঠাৎ চুপ করে যেতে সুরমা বললেন, 'দীপঙ্করবাবুর কথা বলছ?'

চোখ না তুলেই মাথা নাড়ল গার্গী।

'কেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি! এই তো গেলেন, কিছুক্ষণ আগে। গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন—'

সুরমার কথায় দুটো ঘটনা স্পষ্ট। দীপঙ্কর এসেছিল এবং তার জন্যে কোনো খবর রেখে যায়নি। এর পরেও কি প্রশ্ন থাকে? গার্গী উঠে যাবার কথা ভাবল।

সুরমা জিজ্ঞেস করলেন, 'চা খাবে?'

'না।'

'খাও না! উনি একটু আগে ফিরেছেন। চা হচ্ছে, আমরাও খাবো।'

গার্গী না বলতে পারল না। এবং বুঝতে পারল চা খাবার কথায় মাথা নেড়ে ভুলই করেছে। আরও কিছুটা সময় এখা[illegible]াতে হবে তাকে।

যেটা জানবার জেনে গেছে, এই বাড়তি সময়টুকু এখানে খরচ করে লাভ কি ! এমনও মনে হলো, সুরমা যেন আজ তার প্রতি একটু বেশিই আগ্রহ দেখাচ্ছেন ।

কাজের মেয়েটিকে ডেকে দু কাপ চা দেবার কথা বললেন সুরমা । গোপালবাবু কাশছেন । সামান্য হাঁফ-জড়ানো সেই শব্দ উঠেই থেমে গেল। পরিচিত শব্দ । রাত যতো এগোবে এই শব্দটাও বাড়বে ততো ।

'তুমি কখন এসেছ ?'

'এই তো, মিনিট পনেরো ।' স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় গার্গী বলল, 'ও বলেইছিল তাড়া আছে, আবার অফিসে ফিরতে হবে । আমার আসতে দেরি হয়ে গেল ।'

'দীপ্র কোথায় ?'

'আমার মায়ের কাছে । সকাল থেকে জ্বর বাঁধিয়ে বসেছে ।'

'তোমার বাপের বাড়ি তো পার্ক সার্কাসে ?'

গার্গী আবার মাথা নাড়ল । দৃষ্টি নামিয়ে নিল । আলোয় চকচক করছে সুরমার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলে লাগানো রিঙটা । বাড়ি ভাড়া নেবার জন্যে যেদিন প্রথম এসেছিল দীপঙ্করের সঙ্গে, এবং কথাও পাকা হয়ে গেল, সেদিন সুরমাকে ইমপ্রেস করার জন্যে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল সে, রিঙটা তখনই চোখে পড়ে । ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে গার্গীর মনে হলো কথা এগোচ্ছে, কথার মধ্যে বিষয় থাকছে না কোনো । স্বাভাবিকের চেয়ে অন্যরকম লাগছে সুরমাকে । সাড়ে সাতটা বাজতে চলল, এবার তার ফেরা দরকার । চায়ে দু চুমুক দিয়েই সে উঠে পড়বে ।

'আজ তাহলে চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ । ছেলেটা ভালো থাকলে আজই আসতাম ।' ইতস্তত করে বলল গার্গী, 'অফিস থেকে ফিরে দেখলাম জ্বর—'

মেয়েটি দু কাপ চা দিয়ে গেল । একটা অবলম্বন পাবার মতো নিজের কাপটা তুলে নিল গার্গী । ভিতরের ঘর থেকে টি-ভি চলার আওয়াজ আসছে । খবর শুরু হলো ।

সুরমা চিন্তিত, একটু বা অন্যমনস্ক। তার কথা শুনে, নাকি অন্য কিছু ভাবছেন, তা বুঝবার উপায় নেই। গার্গী মনে করবার চেষ্টা করল শেষ কবে সে দোতলায় এসেছিল। সত্যনারায়ণ পুজো উপলক্ষে কি ? না, তার পরেও এসেছিল একদিন, মনের ভুলে দরজার চাবিটা ফেলে এসেছিল ভিতরে—দীপঙ্কর ফিরে না আসা পর্যন্ত দীপ্রকে নিয়ে অপেক্ষা করেছিল ওপরে। সেদিন অবশ্য সময়ের আগেই বাড়ি ফিরেছিল দীপঙ্কর।

'দীপ্রকে দেখাশোনার লোক ঠিক হয়নি এখনো ?'

'না। কোথায় আর পাচ্ছি !' নিঃশ্বাস টেনে, আবার ছাড়তে ছাড়তে অনুতাপের গলায় গার্গী বলল, 'তিন মাস হয়ে গেল। কমলা গিয়ে যে কী বিপদে পড়েছি ! দু-তিনজনকে দেখলাম, ওরা চাকরি করার জন্যেই আসছে—বেশি টাকা চায়, সময়ও কম দেবে। তেমন ডিপেন্ডেবল মনে হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ। কমলা মানুষটা ভালো ছিল। দীপ্রকে ভালোবাসত খুব। আমিও দেখেছি।'

'কিন্তু, কী ভাগ্য দেখুন ! কোথাও কিছু নেই, তিন দিনের জ্বরে ছেলেটা মরে গেল !'

'টগরের মা বলছিল ও নাকি দেশে চলে গেছে ?'

'হবে। আমি তো বস্তিতে ওর বাড়িতে পর্যন্ত গেছি। কতো বোঝালাম। চুপ করে থাকল।'

'কিন্তু, লোক না পেলে তোমারই বা চলবে কী করে !' চায়ে চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখলেন সুরমা। ভারী চেহারা নিয়ে নড়ে বসলেন সামান্য, 'তুমি ওখানে। দীপঙ্করবাবুর নিশ্চয়ই এখানে অসুবিধে হচ্ছে খুব !'

'না, অসুবিধে আর কি !' বলার তাড়ায় বলে ফেলল গার্গী, 'পরশুর রাতটা ছিল। কাল সারাদিন যা গেল, আসবে ভেবেও আসতে পারেনি। কাল ও নিজের বাবা-মা'র কাছে ছিল। বালিগঞ্জ প্লেসে। হয়তো—'

গার্গী শেষ করতে পারল না। তার আগেই সুরমা বললেন, 'কেন ! কাল সন্ধেবেলায় তো উনি এসেছিলেন !'

'এখানে !'

'তুমি জানতে না !' গার্গীর অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে সূক্ষ্ম রেখায় হাসলেন সুরমা, 'কাল সন্ধের পর। তখন বৃষ্টিটা ধরেছিল একটু। একটা জীপগাড়ি নিয়ে। সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। তোমাদেরই বয়সী। ফর্সা, গোল মতন মুখ, স্বাস্থ্যও বেশ ভালো।—'

সুরমা থামলেন। দু এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে যোগ করলেন, 'আমরা তো ভাবলাম তুমিও আছ বাড়িতে।'

অনুভূতিটা ফিরে আসছে। স্তব্ধভাবে বসে থাকতে থাকতে গার্গী টের পেল, উত্তেজনা সঞ্চারের মতো একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। যেমন প্রায়ই হয় আজকাল। অনুভূতি আড়াল করতে করতেই ও বুঝতে পারল আজ সুরমার আচরণ, কথাবার্তা কেন স্বাভাবিকের চেয়ে অন্যরকম লাগছিল। হয়তো আশা করতে পারেননি সে এমন হঠাৎ এসে পড়বে, নিজেই বেল দেবে দরজায়। তাই, প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও গোছাতে পারছিলেন না নিজেকে। না এলে সুরমা আজ না হোক কাল নিজেই যেতেন তার কাছে, বলতেন একই কথা। 'তুমিও আছ বাড়িতে' কথাগুলো বানানো। কিন্তু তার আগের কথাগুলো অবিশ্বাস করবে কী করে ! খানিক আগে পরিপাটি করে গুছিয়ে আসা বিছানাটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল সে।

এই পরিবেশ অসহ্য লাগতে শুরু করায় উঠে পড়ল গার্গী এবং এই মুহূর্তের সমগ্র লজ্জা ও অসহায়তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। ওর এক দিদি বম্বে থেকে এসেছিল। তখন জানত না আমি আটকে পড়েছি, বাড়ি ফিরতে পারব না। এখান থেকে বালিগঞ্জ প্লেসে গিয়েছিল। ওখান থেকেই ফোন করেছিল আমাকে।'

গার্গী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুরমা বললেন, 'তুমি জানতে !'

গার্গী জবাব দিল না। সিঁড়ি নামতে নামতে ভাবল, এভাবে না বললেও পারত। কাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সে ? নিজেকে ? দীপঙ্করকে ? নাকি তাদের সম্পর্কটাকে ? এই সম্পর্কে সুরমারই বা জায়গা কোথায় ! কিন্তু, এসব মিথ্যা তো দীপ্রও ধরে ফেলবে।

নীচে এসে একবার পিছনে তাকাল গার্গী। হাসবার চেষ্টা করেও পারল না। সুরমাও নির্বাক। দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এসে প্রায় শূন্যতার

মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, কাল তাহলে কলকাতা ভাসেনি, ব্রীজের নীচেও জল জমেনি, বাপ-ছেলের নতুন গড়ে ওঠা সম্পর্কের কথা ভেবে সে বৃথাই আশ্বস্ত ও বিষণ্ণ বোধ করেছিল।

অভ্যস্ত রাস্তা। মন দেখায় না কিছু। শুধু পা দুটোই হাঁটছে। এক মাথা রাগ, ঘৃণা, অপমান ও অনিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে যেতে যেতে ক্রমশ রাগ, ঘৃণা, অপমান ও অনিশ্চয়তাগুলো হারিয়ে আপাদমস্তক অবশ হয়ে উঠল গার্গীর। ক্ষত গভীর অথচ রক্তহীন হলে যেমন হয়, অবরুদ্ধ রক্তের চাপে ফুলে ওঠে আশপাশ, অনেকটা তেমনি, এখনকার অনুভূতি বলতে সেরকম। এইমাত্র কিছু একটা ঘটেছে, সেটা বুঝতে পারলেও আশপাশের অন্য চিন্তা এসে গুলিয়ে দিচ্ছে ঘটনার তাৎপর্য।

সুরমা যা বললেন তার অর্থ খুঁজতে গিয়ে বিশেষ এগোতে পারল না সে।

দীপঙ্করকে কি জিজ্ঞেস করবে ? কিন্তু, দীপঙ্কর যদি পুরো ঘটনাই অস্বীকার করে তাহলে অর্থ দাঁড়াবে দুটো। হয় সে সত্যি বলছে, না হয় গোপন করে যাচ্ছে ঘটনা। তাহলে কি দীপঙ্করের প্রবঞ্চনা ধরিয়ে দেবার জন্যে আবার সুরমার কাছে ছুটে যাবে সে, তাঁকে সাক্ষী মানার জন্যে ? তার পরেও কি সে আর দীপঙ্কর থাকতে পারবে একসঙ্গে, স্বামী-স্ত্রী হয়ে ? ওই বাড়িতে ?

প্রশ্নগুলো জট পাকিয়ে গেল।

ফেরার তাড়া থাকলেও এখন আর উপলব্ধি করছে না সেটা। বাসে উঠে গভীর অবসাদে সীটের পাশে জানলার ধাতব ফ্রেমে মাথা লাগিয়ে বসে থাকল চুপচাপ। সন্ধের বাসে যাত্রী কম, বিভিন্ন সীটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে ক'জন বসে ক্রমশ আলাদা হয়ে গেল তাদের থেকে। এমনকি রাস্তার দৃশ্য থেকেও। ভুলটা কি তারই ? মাঝখানে দীপ্র না থাকলে কি অভিজ্ঞতা অন্যরকম হতো ?

প্রায় একই ধরনের চিন্তায় আক্রান্ত হয়েছিল কমলা চলে যাবার পরে। ছেলের অসুখ বলে সেই যে গেল, আর ফিরল না। তখন জানত না মারা যাবে ছেলেটা। এমনই ভেঙে পড়বে যে কাজে ফিরবে না আর। গোড়ার

দিকে গার্গী ভেবেছিল দুঃখী মানুষ, শোক পেয়েছে, কিছুদিন গেলে ঠিক হয়ে যাবে আবার। বাঁচা আরও শক্ত। টাকার প্রয়োজন, সংসারের অনটনই ফিরিয়ে আনবে ওকে।

ইতিমধ্যে অফিস কামাই করতে শুরু করেছিল গার্গী। লোকও খুঁজছিল। না পেয়ে ছুটি নিল একটানা তিন সপ্তাহ। সেই ছুটিও শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ দীপ্রকে দেখাশোনার লোক পাচ্ছে না দেখে বাধ্য হয়ে একদিন টগরের মা-কে সঙ্গে নিয়ে কমলার খোঁজে ওদের বস্তিতে গেল।

বিকেল বেলা। লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে বাঁদিকে। রিক্সা অতোদূর যাবে না। অগত্যা পায়ে হেঁটে।

দু পাশে খাপড়া কিংবা টিনের চালা। বাঁশ-মাটির দেয়াল, কোনো কোনোটার পাকা গাঁথনিও চোখে পড়ে। মাঝখানের রাস্তা চার ফুটও চওড়া হবে কিনা সন্দেহ। দু দিকের কাঁচা নর্দমার ওপর তক্তা বা চওড়া পাথর পেতে নীচু দরজার ভিতরে ঢোকা। যেখানে সেখানে তোলা উনুন ঘুঁটে কিংবা গুল দিয়ে ধরানো, আগুন আড়াল হয়ে গেছে কাঁচা গলগলে ধোঁয়ায়। বস্তিতে ঢোকার মুখে টিউবওয়েলের সামনে জটলা করছিল পাঁচ ছ'জন মেয়েমানুষ, টগরের মা-র সঙ্গে গার্গীকে দেখে কৌতূহলী হলো। লাল ফ্রক-পরা একটি মিশমিশে কালো কিশোরী সঙ্গ ধরল তাদের। তারা যতো এগোচ্ছে ততোই এ ঘর ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন উৎসুক দৃষ্টি ছুঁয়ে যেতে লাগল তাকে।

টালির ছাদ, পাকা গাঁথনির একটা নীচু বাড়ির সামনে এসে থামল টগরের মা। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হাত দেড়েক পরিসরের লোহার শিক দেওয়া চৌকো জানলাটা খোলা থাকলেও দরজা বন্ধ। টগরের মা দরজার শিকল ঠুকতে 'কে' বলে একটি রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার লোক উঁকি দিল জানলা দিয়ে। খালি গা, রঙ পরিষ্কারের গা ঘেঁসে, ভাঙা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওরই মধ্যে চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। এমন মুখ দেখলেই চেনা লাগে, কিন্তু বয়স আন্দাজ করা যায় না। পঁয়তাল্লিশ হতে পারে, পঞ্চান্নও হতে পারে। কমলা বলেছিল ওর স্বামী ছুতোর মিস্ত্রি, সে-ই হবে।

লোকটি গার্গীকে আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে দেখল। তারপর টগরের মা-র

দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই !'

টগরের মা ঘাবড়ে গেল। হাবভাব দেখে মনে হলো লোকটির সঙ্গে ও খুব একটা পরিচিত নয়। একটু বা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কমলা আছে ? ও বাড়ির বৌদি এসেছে—'

'কে ?'

'ওই, যেখানে ও ছেলে ধরার কাজ করত।'

লোকটিকে প্রসন্ন লাগছে না। 'দাঁড়ান' বলে অদৃশ্য হলো আড়ালে।

দরজা খুলল মিনিট দু-তিন পরে। গায়ে গেঞ্জি চড়িয়েছে, পরনে লুঙ্গি। ঘরের তক্তপোষের ওপর বসা কমলাকে দেখতে পাচ্ছিল গার্গী। পাশে আট দশ বছরের একটি মেয়ে। নিশ্চিত কমলার, আদলে চেনা যায়। মনে পড়ল, কী কথায় যেন কমলা একদিন বলেছিল, 'মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেবো, বৌদি। ওর বাপের ইচ্ছা ছেলেটাকে কলেজে পড়াবে।'

লোকটি বেরিয়ে এসে জায়গা করে দিল।

'যান।'

টগরের মা বলল, 'যাও, ভিতরে যাও। আমি দু মিনিট ঘুরে আসছি।'

গার্গী ইতস্তত করছিল। ঘরে ঢোকা তো দূরের কথা, এর আগে কখনো কোনো বস্তির ছায়া মাড়ায়নি সে। আশপাশের ঘরগুলো থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে কেউ কেউ তাকে দেখছে দেখে আরও অস্বস্তি। একটা অপরাধবোধও চাড়া দিয়ে উঠল মাথায়। কমলার ছেলে মারা যাবার খবর পেয়েও সে আসেনি ; আজ এসেছে নিজের স্বার্থে, দীপ্রর জন্যে। কমলার স্বামীর তার দিকে তাকানোর ধরনে এমন কিছু ছিল যা তাকে আরও বিব্রত করল।

কমলা নেমে এলো খাট থেকে। বস্তিতে হলেও ঘরের ভিতরটা পরিচ্ছন্ন ; এক কোণ থেকে একটা টুল এনে এগিয়ে দিল তার দিকে।

গার্গী ওকে দেখছিল। আগের চেয়ে কৃশ, কালি পড়েছে চোখের কোলে। চোখ বৃষ্টির পরের গাছের মতো আলগা জলবিন্দুতে ঠাসা, নাড়ালেই ঝরে পড়বে। তখনো তক্তপোষের ওপর বসে থাকা ওর মেয়ের গা ঘেঁসে মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখে মনে হয় এই স্তব্ধতা এ ঘরে

আগেও ছিল, সে চলে যাবার পরেও থাকবে। কমলা যখন তার বাড়িতে যেত, থাকত, তখন মনে হতো ও বাড়িরই লোক। সেই ভরসাতেই এসেছিল। এই পরিবেশে নিজের হতাশাটা চিনতে পারল গার্গী।

'কী হয়েছিল ?'

কমলা মাথা নাড়ল। জানে না।

পরের কথাটা সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেল না গার্গী। ঘরের ভিতর থেকেই বুঝতে পারছিল কমলার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। ঘন হচ্ছে বিকেলের আলো। বস্তির পিছনের রেললাইন ধরে ছুটে যাচ্ছে একটা ট্রেন— শব্দের ভিতরের উৎকণ্ঠা সরব হতে হতে মিলিয়ে গেল দূরে, কোনদিকে বোঝা যায় না। কমলা যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছাকাছি দেয়াল ঘেঁসে একটা চটের থলি চোখে পড়ল। ভিতর থেকে উঁচিয়ে থাকা করাতের দাঁতগুলো এই ঘরের আবছায়াতেও কেমন যেন উজ্জ্বল লাগছে।

'কী করবে ! সবই ভগবানের হাতে।' গার্গী এইভাবেই বলতে চাইল, 'বাড়িতে বসে থাকলে আরও মন খারাপ হবে। কাজে এসো।'

কমলা এবারও সাড়া দিল না।

'দীপ্র তোমার কথা বলে। মাঝে মাঝে কান্নাকাটিও করে।' গার্গী একটু থামল এবং অনুনয়ের ধরনে বলল, 'আমি ছুটি নিয়ে বসে আছি। আর ক'দিন থাকব ! তুমি আমার অবস্থাটাও বুঝে দ্যাখো !'

গার্গী উঠে দাঁড়িয়েছিল। কমলা উত্তর দিচ্ছে না দেখে কিছুটা বেপরোয়া হয়ে বলল, 'তোমারও তো টাকার দরকার। মাসে দেড়শো টাকা পেতে, না হয় বাড়িয়ে দেবো কিছু—'

'আমি কাজ করব না, বৌদি।' কমলা হঠাৎ বলল, 'ছেলের জন্যেই দরকার ছিল।'

গার্গী একটা ধাক্কা খেল। ওর হাত পা কাঁপতে শুরু করেছিল। অসহায় ভাবেই বলল, 'আমাকে বিপদে ফেলে তোমার লাভ কী !'

কমলা চোখ নীচু করে থাকল।

সেই সময় ওর স্বামী ঘরে ঢুকল। কমলা, তার মেয়ে এবং গার্গী, পর পর তিনজনকেই দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি এবার যান, মা। অন্য লোক

খুঁজে নিন। ওকে নিয়ে টানাটানি করবেন না—'

লোকটির দৃষ্টি তারই মুখে নিবদ্ধ। বলার ধরনে সামান্য রুক্ষতা থাকলেও ওর কথায় অভদ্রতা ছিল না। কিন্তু দৃষ্টিতে রাগ, ক্ষোভ অস্পষ্ট নয়। ঘৃণাও কি ? টাকার কথাটা বলা বোধহয় ঠিক হয়নি।

এর পর আর দাঁড়ায়নি গার্গী। যেভাবে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছিল তার চেয়ে দ্রুত। যেন ওই দৃষ্টিও অনুসরণ করছে তাকে। লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে রিক্সায় ওঠার আগে টগরের মা বলল, 'লোক না পেলে ছেলেকে বোর্ডিংয়ে রেখে দাও না !'

গোল পার্কের কাছে জ্যামে আটকে আছে বাসটা। নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ ধরে, খেয়াল করেনি। জোর ঘন্টিটা দমকলের। বাজছে, বেজেই চলেছে। খানিক সেই শব্দটায় কান রেখে পূর্বাবস্থায় ফিরে এলো গার্গী এবং ভাবল, এখন দীপ্রর কাছেই ফিরছে সে, মাঝখানে দীপ্র না থাকলে এই ফেরাটাও থাকত না। তখনো বৃষ্টি পড়ত, সে আটকে পড়ত এবং সুরমার বর্ণনা সত্যি হলে, যা যা ঘটবার তা-ই ঘটত। তখন সিঁড়ি নেমে এসে কোথায় যেত সে ! নিজেরই বাড়িতে ? সিনেমায় যেমন হয় ?

স্মৃতিতে ধারাবাহিকতা নেই। ভাবতে গেলে যে-কোনো জায়গা থেকে ছিঁড়ে আসছে পচা গোলার সুতোর মতো। ধরতে পারছে না পরের সূত্রটা কোথায়। গুছিয়ে ভাববার সুযোগ হয়নি কখনো, সেরকম উপলক্ষও আসেনি, কিন্তু এখন অমিল খণ্ডাংশগুলো জোড়া দিতে গিয়ে গার্গীর মনে হলো, কিছুই হয়তো আকস্মিকভাবে ঘটেনি। সে না জানলেও দীপঙ্কর জানত এভাবেই ঘটবে।

বস্তিতে গিয়ে কমলাকে অনুনয় অনুরোধ করার ঘটনা চেপে গিয়েছিল সে। ভয় ছিল দীপঙ্কর চটে যাবে। ভাববে নিজের জেদ বজায় রাখতে এতোই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে গার্গী যে শোভন অশোভন মানছে না। রঘুনাথ বাঁড়ুজ্যের পুত্রবধূ তাহলে বস্তিতে গিয়ে ঝি-চাকরদের হাতে পায়ে ধরতেও বাকি রাখেনি। এর আগে যেদিন ডিভোর্স করার কথা তুলল, সেদিন ওই কথা বলবার আগে পেডিগ্রি চিনিয়েছিল দীপঙ্কর ; নীহারের মতো অসবর্ণ বলেনি, কিন্তু তাদের সম্পর্ক যে তেলেজলে মিশ খায়নি,

বংশ-রক্তের পার্থক্য একজনকে টানছে এদিকে, আর একজনকে ওদিকে— সেটা বলতে ছাড়েনি।

টারেটেরে কথা বলার এই ধরনটা গার্গীর চেনা। কোণঠাসা হয়ে বলেছিল, 'তুমি অন্যরকম হবে কেন ! মা-কে দেখলেই ছেলে চেনা যায়।'

'চোপ্ !' দীপঙ্কর চেঁচিয়ে উঠেছিল। হাত দুটো মুঠো করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রশমিত করেছিল নিজেকে। পরে বলল, 'সাধে কি ভাবি ডিভোর্স করব !'

তারপর মিটমাট হয়ে গেলেও কথাগুলো হারায়নি। প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো সময় ফিরে আসত। এরকম পরিস্থিতিতে নতুন কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কি !

ছুটি শেষ হয়ে আসছিল। আবার ছুটি বাড়াতে গেলে উইদাউট পে হবে। পরের সিদ্ধান্তটা, সুতরাং, নিজেই নিল গার্গী।

'একটা উপায় ভেবেছি।' সুযোগ খুঁজে দীপঙ্করকে বলল, 'এখন থেকে অফিসে যাবার সময় আমিই স্কুলে পৌঁছে দেবো দীপ্রকে। পার্ক সার্কাস থেকে কেউ এসে নিয়ে যাবে ওকে। ওখানেই খাবে, থাকবে। অফিস থেকে ফেরার সময় আমি নিয়ে আসব।'

'ওঁরা পারবেন ?'

দীপঙ্করের সরল প্রশ্নে অবাক হলো গার্গী। ভেবেছিল পার্ক সার্কাসের নাম শুনে আরও একটা খোঁচা দেবে ও। বলতে পারে, হ্যাঁ, তোমার চাকরি রাখাটা ওদের পক্ষে খুব জরুরি, বা, ছেলের থাকা খাওয়া বাবদ আরও কতো টাকা দিতে হবে ওদের ? সেসব দিকে গেল না শুনে আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'বাবা বলেছে অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া বৌদিও যেতে পারে—দুপুরে ওর ছেলেমেয়েরা স্কুলেই থাকে।'

দীপঙ্কর শুনে গেল। হাতে রবিবারের খবরের কাগজ, মাথা ঝুঁকিয়ে ক্লাসিফায়েড কলামে ব্যবসা খুঁজছে। চোখ তুলল না।

'অসুবিধে তোমার হবে।' গার্গী বলল, 'যেদিন দেরিতে বেরুবে বা দুপুরে ফিরবে, সেদিন একা বসে খেতে হবে। আগে ছেলে থাকত, কমলাও থাকত—'

'ওটা কোনো প্রব্লেম নয়। তাছাড়া— ।' কথা শেষ করল না দীপঙ্কর। উঠে ঘরে গেল, ফিরল সিগারেট ধরিয়ে। ধোঁয়া গেলার সময় নিয়ে বলল, 'বাবা চাইছেন আমি আবার ব্যবসায় ফিরে যাই। ওঁরও অসুবিধে হচ্ছে, শরীর প্রায়ই ভালো থাকে না।'

'তুমি গিয়েছিলে?'

'না। খবর পাঠিয়েছিলেন। পরে দেখা করলাম।'

ইদানীং স্বামীকে এতোটা প্রশান্তির মধ্যে দেখেনি। গার্গী কারণ খুঁজছিল। মনে হচ্ছে যেটুকু বলল তার পরেও আছে কিছু, যেটা এখনই ভাঙতে চায় না। মুখ দেখে বোঝা যায় চেষ্টা করা সত্ত্বেও তেমন কিছু করতে না পারার হতাশা থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনায় ভার নেমে গেছে অনেকটা। এমন হলে স্বভাব থেকে উৎকণ্ঠাও চলে যাবে আস্তে আস্তে। রোজগার বাড়বে। সম্ভবত আরও একটু সচ্ছল হবে তারা।

গভীর থেকে নিঃশ্বাস উঠে এলো গার্গীর। এভাবে ভাবলেও ভালো মন্দ কিছুই বলল না।

'এখনো কিছু ঠিক করিনি।' জবাবদিহি করার গলায় বলল দীপঙ্কর, 'ওখানে ফিরলে আমাকেও ন'টায় বেরুতে হবে। লাঞ্চও অফিসেই খেতে পারি। আমাকে নিয়েও কম ঝঞ্ঝাট যায় না তোমার!'

যেটা সমস্যা মনে হচ্ছিল, এতো সহজে যে তার সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি গার্গী। নিজের জীবনযাপনের ছকটা নিজেই পাল্টে ফেলল দীপঙ্কর।

কিন্তু, এরই কিছুদিন পরে, গার্গী কি ভেবেছিল, সুরমার বর্ণনায় তার ও দীপঙ্করের মধ্যে একটি অবিশ্বাস্য চরিত্র আবির্ভূত হবে! একটি মেয়ে, যে তারই বয়সী, যার রঙ ফর্সা এবং স্বাস্থ্য ভালো—যে সঙ্গে থাকলে প্রবল বৃষ্টির জল ভেঙে জীপে চড়ে অনায়াসে বাড়ি ফিরতে পারে দীপঙ্কর এবং সেইজন্যেই, যাতে এরকম একটা ঘটনা ঘটানো সম্ভব হয়, গার্গীকে শুনতে হয় তাড়াতাড়ি পার্ক সার্কাসে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ, ওয়েদার ফোরকাস্টে বিপজ্জনক বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা, বাপের কথায় ছেলের বাধ্য হয়ে ওঠার কথা!

কে হতে পারে ? কেন এসেছিল সে ? সে কি জানে না দীপঙ্কর বিবাহিত এবং এভাবে আসা শোভন নয় ?

নাকি গার্গীই ভুল ভাবছে, সে আসবে এবং তার সংস্পর্শে নিভৃত ও অন্তরঙ্গ হতে পারবে ভেবেই দক্ষ ড্রাফ্‌ট্‌সম্যান দীপঙ্কর ছকে ফেলেছিল চমৎকার ব্লু-প্রিন্ট, যাতে ওই ব্লু-প্রিন্ট ধ'রই আস্তে আস্তে ঢুকে পড়তে পারে ঘটনার ভিতরের ঘটনায় !

যদি সেটাই মতলব হয়, যদি সত্যি-সত্যিই দীপঙ্করের কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে গার্গী—এমনকি তার শরীরও, তাহলে যার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হতে চায় তাকে নিয়ে খুব সহজে অন্য কোথাও চলে যেতে পারত দীপঙ্কর ! ও বাড়িতে কেন ! দীপঙ্করের জানা উচিত বাড়িটা তার স্ত্রী গার্গীরও, ওখানে প্রতিটি জিনিস গার্গীর নিজের হাতে সাজানো, ওখানে কে আসবে না আসবে সে-সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দীপঙ্করের একার নয়, গার্গীরও। এভাবে তাকে অপমান করার সাহস কী করে পেল দীপঙ্কর !

এতোক্ষণের মানসিক টানাপোড়েন হঠাৎই যেন শারীরিক হয়ে উঠতে চাইছে। দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠায় দুই আঙুলে প্রথমে বাঁ চোখ, তারপর ডান চোখ মুছে নিল গার্গী। তাতেও স্বস্তি না হওয়ায় রুমাল খুঁজল। একটা চিৎকার থমকে আছে ভিতরে, যেন তারই চাপে কুঁকড়ে উঠছে হাতের আঙুলগুলো ; মাথার পিছন থেকে শুরু হয়ে ঘাড় বেয়ে মেরুদণ্ডের দিকে নেমে যাচ্ছে অসহায়তার জ্বালা।

ঠোঁটে দাঁত চেপে সেই মুহূর্তের সমস্ত অস্বস্তি ওঅসহিষ্ণুতা সহ্য করতে করতে গার্গী লক্ষ করল জ্যাম থেকে বেরিয়ে এসে গড়িয়াহাট পেরিয়ে যাচ্ছে বাস, কোনো সীটই খালি নেই আর, ওপরের রড ধরে দাঁড়িয়েও যাচ্ছে কেউ কেউ। কোলে ব্রীফকেস নিয়ে নীল ট্রাউজার্স ও সাদা বুশসার্ট-পরা সবল চেহারার একটি লোক এসে বসেছে তার পাশে, গায়ে ঘামের উগ্র গন্ধ ; ব্রীফকেস খোলার ভঙ্গিতে গায়ে গায়ে হয়ে এলো। ইচ্ছে করে, নাকি অসাবধানে ? সংস্পর্শ বাঁচাতে নিজেকে সিঁটিয়ে নিল গার্গী। ফুটপাথ দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা দ্রুতই হাঁটছে, ওরই মধ্যে একটি লোককে

ছাতা খুলতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় খুঁটিয়ে দেখল বাইরেটা। বৃষ্টিই পড়ছে, প্রায় না-পড়ার ধরনে। কে জানে, রাতের দিকে হয়তো জোরে নামবে। শিখাকে বলে এসেছিল দেখা করতে যাচ্ছে দীপঙ্করের সঙ্গে, মাঝখানে প্রায় দু.ঘণ্টা কেটে গেল। শিখা হয়তো জিজ্ঞেস করবে না কিছু, কিন্তু আর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে—প্রমোদ কিংবা সুবর্ণা, বিশেষত দীপ্র, কী বলবে সে ?

প্রশ্নটা দাঁড়াল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, কাল দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা হলে সে কী বলবে ? যে-অবস্থায় তাকে রেখে গেল লোকটা, তার পরেও কি তার সঙ্গে দেখা করা উচিত ? যদি না করে, এড়িয়ে যায়, দীপ্রকে কী বলবে ?

সমস্যা সেখানেই। দীপ্র কখন কী প্রশ্ন করবে, তার উত্তরই বা কী হবে, সব সময় ভেবে উঠতে পারে না তা। এখনো পাঁচ হয়নি, কিন্তু ছেলের হাবভাব দেখে বা মাঝেমধ্যের কথা বা প্রশ্ন শুনে যতো দিন যাচ্ছে ততোই মনে হচ্ছে বয়সের তুলনায় ওর মানসিকতা কেমন যেন বেমানান ; চুপচাপ থাকতে থাকতেই এমন বেয়াড়া সব প্রশ্ন করে যার জবাব দিতে গিয়ে পড়তে হয় দ্বিধায়, বিরক্তিও এসে যায় মাঝে মাঝে। তখন মনে হয় ওর শৈশব নেই ; অজ্ঞাত কারণে ও যেন ওর বয়সের পক্ষে স্বাভাবিক আগ্রহ, প্রবণতা, প্রশ্ন ভুলে কৌতূহলী হয়ে পড়ছে বড়োদের জগৎ সম্পর্কে।

বেশিদিনের কথা নয়। দীপঙ্কর কাকে তুলে নিয়ে অফিসে যাবে, বেরুবে অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি। স্বামীর বেরুবার জোগাড় করতে গিয়ে ছেলেকে তৈরি করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। এরপর দীপ্রকে পৌঁছুবার জন্যে ট্যাক্সি না ধরলে দেরি হয়ে যাবে স্কুলের। যতো তাড়াতাড়ি পারে নিজেও তৈরি হয়ে নিল গার্গী।

তবু আশঙ্কা যায়নি। গার্গী লক্ষ করল দেরি হয়ে গেছে ভেবে দীপ্রও বেশ উৎকণ্ঠ। ট্যাক্সিতে উঠে ঘড়ি দেখে ছেলেকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলল, 'মনে হচ্ছে দেরি হবে না। যদি স্কুল বসে যায় আমি তোমার আন্টিকে গিয়ে বলব।'

দীপ্র বলল, 'তাহলে আন্টি তোমাকেও বকবে।'

'না। বুঝিয়ে বললে বকবেন কেন!' ছেলেকে নির্ভয় করতে চাইল গার্গী, 'আন্টিরাও তো আমাদের মতো। বাড়িঘর সামলে আসেন। তাঁদের বুঝি কখনো দেরি হয় না!'

দীপ্র চুপ করে থাকল। অন্য কিছু ভাবছে। খানিক দূর এসে বলল, 'শান্তনু বোধহয় আজও আসবে না—'

'কেন! কাল আসেনি বুঝি?'

দীপ্র মাথা নাড়ল।'

'জ্বরটর হয়েছে বোধহয়। থাকেও তো দূরে।'

বসবার জায়গায় কোনোরকমে পাছা ছুঁইয়ে সামনের সীটের পিছনটা দু হাতে আঁকড়ে আছে দীপ্র। ভঙ্গিতে অধৈর্য, যেন ট্যাক্সির সঙ্গে সঙ্গে ও-ও দৌড়চ্ছে। দৃষ্টি উদগ্রীব। খানিক ওইভাবে বসে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মা, মা-রা কখনো খারাপ হয়?'

প্রশ্নটা ঠিকঠাক শুনলেও অর্থ বোধগম্য হলো না গার্গীর। অবাক, কিছুটা ধমকের গলায় বলল, 'কে তোমাকে বলে এসব কথা!'

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পাশ ঘুরে মা-কে দেখল দীপ্র।

'শান্তনু বলছিল ওর মা খারাপ।'

'ছিঃ, দীপ্র! এইসব কথা বলো তোমরা!'

'আমরা বলিনি। শান্তনুর বাবা ওকে বলেছে।'

নিজের মধ্যে থেমে এলো গার্গী। মুহূর্ত পরে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলেছে?'

'বললাম তো! খারাপ!' দীপ্র বলল, 'ওর মা কোথায় চলে গেছে! আর স্কুলে আসে না।'

গীতশ্রী। কয়েকবার দেখা হওয়ায় আগেকার অপরিচয় আর নেই। তাহলেও অনেকদিন আগে দেখা একটা উদ্‌ভ্রান্তির দৃশ্য মনে পড়ে গেল গার্গীর। কপালে সিঁদুরের টিপ ছিতরানো, কাঁধের ওপর বিসদৃশভাবে বেরিয়ে আছে ব্রা-র স্ট্র্যাপ। ছুটে আসার কারণে সমতা ছিল না নিঃশ্বাসের ওঠা নামায়। দৃশ্যটা চোখে রেখেই জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ও স্কুলে আসে কার সঙ্গে?'

'ওর কাকার সঙ্গে।' দীপ্র বলল, 'কাল আসেনি।'

ছেলের কাঁধে হাত রেখে ওকে নিজের কাছে টেনে নিল গার্গী। বস্তুত, এক ধরনের আবেগে পর্যুদস্ত লাগছিল নিজেকে। বলল, 'বোকা ! মা কখনো খারাপ হয় ! এরপর তো আমাকেও খারাপ বলবি !'

'না, তুমি ভালো।' দীপ্র হঠাৎ গার্গীর আঁচল চেপে ধরল। ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগে।'

ঘটনাটা নিয়ে এর পরেও ভেবেছে গার্গী। হদিশ পায়নি। তখন ভেবেছিল কে কোথায় কোন জটিলতার মধ্যে দিয়ে হাঁটছে কে বলবে ! কী করেছিল গীতশ্রী, কেনই বা সে চলে গেল কোথায়, কেন শান্তনুর বাবা ওইটুকু ছেলেকে বলল অমন সর্বনেশে কথা ! কোন ধরনের সম্পর্ক ছিল ওদের ! সত্যিই কি আছে এমন কোনো সম্পর্ক যা নিভাঁজ স্বামী-স্ত্রীরই, সেই জন্যেই অভিন্ন, একাত্ম ! নাকি সম্পর্কজনিত সংস্কারের আড়ালে যে যার মতো করে হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত, কেউ কেউ নিঃসম্পর্কিতও !

সন্দেহই জড়িয়ে ফেলে আরও বেশি সন্দেহে। ভুলে-যাওয়া সাধারণ ঘটনাও ভিতর খুলে দেখায়।

মনে পড়ল, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সে তখন সারাক্ষণ আগলে থাকে দীপ্রকে ; আর কোনো কাজ নেই, সুতরাং তাড়াও নেই—ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে একদিন অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে, পাশে পাশে এগিয়ে এলো গীতশ্রী। এখন স্কুল থেকে কিছুটা দূরে দোতলা বাড়ির বারান্দার জটলায় গিয়ে বসবে। অপেক্ষা করবে স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত।

গীতশ্রীই টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু নিজে বসল না বেশিক্ষণ। মিনিট পনেরো কুড়ি পরে তাড়া দেখিয়ে বলল, 'আমাকে একটু যেতে হবে, ভাই। আপনি তো আছেন এখানে ? ছুটি হওয়ার আগেই ফিরব।'

'কোথায় যাবেন ?'

গীতশ্রী ইতস্তত করল। বিরক্ত না হয়েও তার দিকে এমন চাউনি মেলে ধরল যেন এ প্রশ্নটা না করলেই ভালো হতো। তারপর বলল, 'চাকরি করতে—'

'চাকরি !'

দৃষ্টিতে তারতম্য নেই। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটল না। বুকের ওপর শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে গীতশ্রী বলল, 'কয়েকজন অবাঙালিকে ল্যাংগুয়েজ শেখাই। বাংলা।'

'কোথায় ?'

'সে আছে। যদি চান একদিন আপনাকেও নিয়ে যাবো।' গীতশ্রী ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটু বা অপ্রতিভ। বাস রাস্তার দিকে তাকিয়ে অন্যরকম গলায় বলল, 'আরও অনেকেই শেখায়। সংসারের জন্যে, নিজের জন্যে কার না দরকার টাকার ! এই স্কুলেই কতো দিতে হয় বলুন তো !'

স্বগতোক্তির মতো ; ওর চেপে চেপে বলার ধরনে গার্গী অনুমান করল গীতশ্রী বানিয়ে বলছে, অন্তত যা বলছে তার পুরোটা সত্যি নয়। সম্ভবত আজও এড়িয়ে গেল।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই ওকে অনুসরণ করে গার্গী দেখল, বাস রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে পৌঁছে একটা ছাই রঙের ফিয়াটে উঠল গীতশ্রী। সঙ্গে সঙ্গে উধাও হলো গাড়িটা। তখন খেয়াল হলো, ফিয়াটটা ওখানে এসে পার্ক করবার পর থেকেই যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল গীতশ্রী। গাড়িটা কি ওর নিজের ? না, তা হতে পারে না। ছেলেকে নিয়ে ও আসে সোদপুর থেকে। ট্রেনে। তা ছাড়া, নিজের গাড়ি হলে অতো দূরেই বা পার্ক করবে কেন !

বাসটা কি আবার আটকে পড়েছে জ্যামে ? হয়তো। চারপাশে বিভিন্ন হর্নের শব্দ এবং যাত্রীদের কথাবার্তা হঠাৎ সরব হয়ে ওঠায় চটকা ভেঙে জানলা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল গার্গী। অন্য সব গাড়ির গতি অবরোধ করে আড়াআড়ি আগুপিছু করছে একটা ডাবলডেকার, এগিয়ে এলে সামনেটাই দেখা যাচ্ছে শুধু। সম্ভবত গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পাশের রাস্তা থেকে বাঁক নেবার সময়। জট না ছাড়া পর্যন্ত তাকিয়েই থাকল সে। আচ্ছন্ন ছিল ; আচ্ছন্নই বোধ করল।

একটা গোটা স্মৃতি পেরিয়ে আসতে বেশিক্ষণ লাগে না। কিন্তু, অন্যমনস্কতা থেকে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসতে আসতে গার্গীর

মনে হলো সে ঢুকে পড়েছিল অদ্ভুত সময়-শূন্যতায়—যেখানে চেতনা থাকলেও থাকে না অনুভূতি, দেখা ও অদেখায় মেশা রহস্য বুঝতে দেয় না কোন সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে কতোটা দূরত্বে ! কী আছে সেই দূরত্বের শেষে ! এমনকি দীপঙ্করকে জড়িয়ে যে-জ্বালা এতোক্ষণ অস্থির ও অবিন্যস্ত করে রেখেছিল তাকে, তার রেশ থেকে গেলেও বুঝতে পারছে না এর পর কী করবে সে, কী করা উচিত। যদি এমন হয় যে, যা ঘটেছে বলে জানালেন সুরমা তার সবটাই দীপঙ্করের আড়ালের খেলা নয়, বস্তুত সে ক্লান্ত, বিরক্ত, নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে স্ত্রীর প্রতি—পরোক্ষে এ তার প্রত্যাখ্যানেরই ভূমিকা, তাহলে, সেও কি প্রত্যাখ্যান করবে দীপঙ্করকে ?

বিষয়টা ভাবতে গিয়ে এলোমেলো হয়ে উঠল গার্গী। তাহলে আমি দাঁড়াবো কোথায় ! ভাবল, দীপ্ররই বা কী হবে ?

বাড়ির কাছাকাছি বাস স্টপে নেমে মন্থর পায়ে হাঁটতে শুরু করল গার্গী। কিছু অপমান, কিছু বা অভিমানে স্তব্ধ, ঝাঁ-ঝাঁ করছে মাথা। শরীরেও যেন জোর নেই কোনো। বৃষ্টি এখনো পড়ছে, বাস থেকে যতোটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে জোরে। মুখে, হাতে বৃষ্টির রেণু ভিজে স্পর্শ রাখলেও জোরে হাঁটার আগ্রহ বোধ করল না সে।

রাস্তার দুদিকে ঘন বসতি, তবু সন্ধে হতে না হতে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ে পাড়াটা। ঝিমুনো আলোয় লোকজন, গাড়ি কি রিক্সা এতোই কম চলাচল করে যে হাতে গোনা যায়। বৃষ্টির জন্যেই সম্ভবত এখন আরও বিরল। ছাতা মাথায় দুটি যুবক তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার পর একা হয়ে পড়ল সে। পিছনে তাকিয়ে দেখল ট্রাম রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি বাঁক ঘুরল এদিকে, তারপর আবার ডানদিকে। পিছনের সীটে খুব ঘন হয়ে বসে আছে দুটি যুবক-যুবতী ; ওই রাস্তা থেকেই বেরিয়ে এলো ধুতি পাঞ্জাবি এবং চোখে চশমা পরা এক সাইকেল আরোহী। টিভি-তে কোনো সিরিয়াল চলছে বোধ হয়, একটি গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠের সংলাপ ভেসে এলো কানে, স্পষ্ট হলো না কথাগুলো। বাড়িতে টিভি নেই, মনে পড়ল অনেকদিন সে টিভি দেখেনি।

টুকরো টুকরো এইসব দৃশ্য ও শব্দের ভিতর দিয়ে হেঁটে এসে বাঁদিকের

সরু গলিতে ঢোকবার আগে সামান্য সচেতন হলো গার্গী। পাঁচিল-ঘেরা পুরনো বাড়ির কম্পাউন্ডের ঝাউগাছের ছায়া পড়ে যে-জায়গাটা প্রায়ই অন্ধকার হয়ে থাকে, সেখানে পার্ক করা আছে একটা অ্যামবাসাডর। কালোই হবে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে জল গড়াতে শুরু করেছে গা দিয়ে। দেখে মনে হলো চেনা। ইন্দ্রনাথের গাড়ি নয় তো? তাদের গলিতে পাশাপাশি দুটো গাড়ি যেতে পারে না। ইন্দ্র এলে এখানেই গাড়ি রাখে।

দরজা খুলে দিল শিখা। অনুমানে ভুল হয়নি। ছোট বসবার ঘরে শিখার ছেলেমেয়ে,প্রবাল আর পাখির সঙ্গে গল্প করছে ইন্দ্রনাথ। পাশের ইজিচেয়ারের চওড়া হাতলে চশমা পড়ে আছে একটা। নিশ্চিত বাবার। তার মানে প্রমোদও ছিলেন এখানে।

প্রথম কথাটা শিখাকেই জিজ্ঞেস করল।

'দীপ্র কেমন আছে, বৌদি?'

'ভালো। জ্বরটা নেমেছে। মা ওকে খাইয়ে দিচ্ছেন।'

'রাস্তায় যা জ্যাম!' অপরাধবোধ থেকে একটা কৈফিয়ৎ দেবার চেষ্টা করল গার্গী। তারপর ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইন্দ্রদা কখন এলেন?'

'প্রায় ঘণ্টাখানেক। তুমি যে এখানে আছ জানতাম না। এসে শুনলাম।'

শিখা ভিতরে চলে গেল। সেও যাবে। অফিস থেকে ফিরে ছেলেটাকে মুখ দেখিয়েছিল মাত্র, দীপ্রর অভিমান হতে পারে। সাড়ে আটটা বাজে প্রায়। শিখাকে বলে গেলেও দেরি দেখে কে কী ভাবছে কে জানে।

ভিতরে যাবার আগে তবু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল গার্গী। ইন্দ্রর সঙ্গে চোখাচোখি হতে দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

ইন্দ্র হঠাৎ বলল, 'জ্বর কি শুধু ছেলের? নাকি তোমারও?'

'কেন!'

'মুখ দেখে মনে হচ্ছে। ভিজেও এসেছ দেখছি!'

ইন্দ্রর দৃষ্টি ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। নিজের মধ্যে সামান্য কেঁপে উঠল গার্গী। তারপর এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আজ আবার বৃষ্টি নামবে ভাবিনি।

আপনি বসুন। আমি ছেলেটাকে একটু দেখে আসি।'

ভিতরে যাবার আগে প্রমোদের চশমাটা তুলে নিল গার্গী।

এমন হয় কী করে ! ঘণ্টা দুয়েক আগে দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেরি হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে ভেবেছিল তার তাড়া আছে ভেবে কেউই এগিয়ে আসবে না লিফ্‌ট দিতে, নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। আসলে তখন মনে পড়েছিল ইন্দ্রনাথকে। অকারণে নয়।

গতকাল দীপঙ্কর যখন তাকে ওয়েদার ফোরকাস্টের কথা তুলে আরও বৃষ্টি নামবে বলে ভয় দেখালো, বলল তাড়াতাড়ি পার্ক সার্কাসে ফিরে যেতে, তখন লোকজন কমে আসা অফিসের জানলা দিয়ে নীচে তাকিয়ে গার্গী বুঝে উঠতে পারছিল না পার্ক সার্কাসেই বা ফিরবে কীভাবে। জল থৈ-থৈ করছে ফ্রী স্কুল স্ট্রিটে। প্রায় হাঁটুজল ঠেলে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে রিক্সা, মোটর, ট্যাক্সি।

এখানে এমন হলে আশপাশের রাস্তাগুলোতেও জল জমবে, ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাহলে কি জল ঠেঙিয়ে যেতে হবে তাকে ! নন্দিতা থাকলে ওর গাড়িতে একটু এগিয়ে দেবার কথা বলতে পারত। কিন্তু, সেও যে কখন চলে গেল, খেয়াল করেনি। অগত্যা হেঁটেই যাবে বলে মনে মনে তৈরি হচ্ছিল গার্গী, সেই সময় জগদীশ বেয়ারা এসে বলল, 'দিদি, এক সাহেব দেখা করতে এসেছে আপনার সঙ্গে—'

'কোথায় ?'

'রিসেপশন থেকে বলল। আমি বলেছি আপনি আছেন। ওয়েট করছেন।'

এই বৃষ্টিতে কে আবার এলো তার খোঁজে ! কোনো মুখই মনে পড়ল না। বস্তুত সে চেনেই বা ক'জনকে !

তৈরি হয়ে নীচে নেমে এসে দেখল, ইন্দ্রনাথ। রাস্তার দিকে মুখ করে জল দেখছে।

'আ-রে, আপনি !'

'অবাক হচ্ছো তো !' ইন্দ্র বলল, 'দ্যাখো, আমার হাঞ্চটা লেগে গেল

কেমন ! ফুড করপোরেশনে এসেছিলাম, ফেরার সময় তোমার অফিসটা চোখে পড়ল । ভাবলাম খোঁজ করে দেখি আছ কি না । বাড়ি ফিরবে তো ?'

এমনিতে আসবার লোক নয়, গার্গী বুঝল, জল দেখেই এসেছে ইন্দ্র । ফেরার দুর্ভাবনা নেমে যেতে সহাস্য হ'লো সে ।

'আজ আমার বাড়ি যাওয়া নেই ।'

'কেন ?'

'কর্তা ফোন করেছিল । বলল ওদিকে খুব জল, আজ পার্ক সার্কাসে থেকে যেতে ।'

'তাহলে তো আরও ভালো । আমি ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের কাছে যাবো ।'

জমা জল দৈর্ঘ্য বাড়ায় না রাস্তার । গাড়িতে ইন্দ্রর পাশে বসে যেতে না যেতেই ফুরিয়ে গেল যাওয়া । এর মধ্যে শুধু অশোকার খবরটুকুই নিতে পেরেছিল ।

ইন্দ্র বলল, 'ও আর কেমন থাকবে ! ভাষাটা বুঝলে বুঝতাম কেমন আছে । তবে টিকে আছে এখনো । তুমি লোক পেলে ?'

'না । কী টেনসন যে যাচ্ছে !' এরপর মনের কথাটা বলে ফেলল গার্গী, 'এবার আমিও পড়ব । হঠাৎ-হঠাৎ এতো টায়ার্ড লাগে !'

জলের রাস্তা পেরিয়ে এসে স্পীড বাড়িয়ে দিল ইন্দ্র ।

'এই বয়সে টায়ার্ড লাগবে কেন ?'

'জানি না', গার্গী বলতে যাচ্ছিল, সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে । পরের কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল । একটু আগেই অশোকাকে নিয়ে আলোচনা করেছে তারা ।

'ব্লাড-সুগার চেক করিয়েছ কখনো ? তোমার বাবারও তো আছে !'

গার্গী দেখছিল রাস্তা কমে আসছে । সামনের কাঁচে চাপা শব্দে হাতুড়ি পিটছে ওয়াইপার । ইন্দ্র শর্টকাট চেনে, জানে কোন রাস্তায় গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুবে ।

'আমার চেনা ভালো প্যাথোলজিস্ট আছে । ডক্টর ব্যানার্জি । দরকার হলে বোলো, নিয়ে যাবো ।'

বাড়ি পর্যন্ত আসেনি ইন্দ্র। ঝাউগাছের কাছে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'কাউকে বোলো না আবার! জানতে পারলে শিখা ভাববে এতোটা এসেও এলাম না।'

নিষেধ করার দরকার ছিল না। গার্গীর ভয় অন্য। দীপ্র জানলে কথায় কথায় দীপঙ্করও জেনে যেত হয়তো। তা ছাড়া, ইন্দ্র তার কথা ভেবেই এসেছিল ; একান্তের এই বোধটুকু সে ভাগ করবে কেন!

দীপ্র ভালোই আছে। গায়ে হাত দিয়ে তাপের পরিবর্তে ঘামের ছোঁয়া লাগল। তবে চোখের ঘোলাটে ভাব যায়নি।

ওকে বাথরুম থেকে ঘুরিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল গার্গী। সঙ্গে সঙ্গে পাশ ফিরল দীপ্র। মনে হয় ভিতরে-ভিতরে কাহিল হয়ে পড়েছে। ওষুধটায় ঘুম পায়।

ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বৃষ্টির শব্দ শুনছিল গার্গী। তেমন জোরে নয়। পরে মনে হলো, শব্দটা কি সত্যিই আছে, নাকি উঠে আসছে তার নিজেরই ভিতর থেকে!

'তুমি কি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে, মা?' দীপ্র হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বাবার কাছে?'

'কে বলল তোমাকে?'

'কেউ বলেনি। মনে হলো।'

গার্গী একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। বাড়ি ফেরার পর কেউই কোনো প্রশ্ন করেনি তাকে। প্রমোদের শরীর ভালো নেই, শুয়ে আছেন পাশের ঘরে। সুমিত্রা পরীক্ষার খাতা নিয়ে ব্যস্ত। সুবর্ণা বোধহয় ইন্দ্রর কাছে গিয়ে বসেছেন। নিজের পরিপার্শ্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে উত্তরটা পেয়ে গেল গার্গী। নুয়ে এসে চুমু খেল ছেলের কপালে।

'আমি অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম। বাড়ি গেলে তোমাকে নিয়ে যেতাম না!'

হাত বাড়িয়ে কপালের ওপর গার্গীর হাতটা চেপে ধরল দীপ্র। এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

গার্গী ফিরে এলো বসবার ঘরে। অশোকার চিকিৎসা নিয়ে সুবর্ণার সঙ্গে

কথা বলছিল ইন্দ্র। একটু পরেই বলল, 'আজ উঠছি। আর একদিন আসবো।'

'বৃষ্টি পড়ছে তো!' জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে নিল গার্গী। তারপর বলল, 'চলুন, ছাতা নিয়ে এগিয়ে দিচ্ছি গাড়ি পর্যন্ত।'

'তুমি আবার ভিজবে কেন!'

জবাব না দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ভিতরে ঢুকে নিজের ছাতাটা নিয়ে ফিরে এলো গার্গী।

'চলুন।'

গলিতে লোকজন নেই। এক পশলা হয়ে যাবার পর থিতিয়ে এসেছে বৃষ্টিও। তবে হাওয়ার জোর বাড়ায় ঝাপটা দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

ছোট ছাতার নীচে পাশাপাশি কিছুটা এগিয়ে এসে ইন্দ্র ঠাট্টা করল, 'দুজনেই সুজন হওয়ার চেয়ে একজন দুর্জন হওয়া ভালো। এভাবে দুজনেই ভিজছি। তুমি বরং ছাতাটা নাও!'

'আমি তো ভিজেই এসেছি। দেখলেন না!' ছাতাটা ইন্দ্রর মাথায় বাড়িয়ে ধরতে ওর গায়ে গায়ে সরে এসে গার্গী বলল, 'আসলে আজ আমার বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না। কিছুই ভালো লাগছে না।'

পাশে তাকিয়ে ওর মুখ দেখবার চেষ্টা করল ইন্দ্র। বাদামি গালে লেপটে আছে কয়েকটা চুল; ভিজে না থাকলে হাওয়ায় উড়ত। আবছায়ায় চকচক করছে কানের মুক্তো।

'তোমার কী হয়েছে বলো তো! গোড়া থেকেই থমথমে দেখছি!'

'কী আর হবে!' নিজেকে সংযত করে নিয়ে গার্গী বলল, 'হলে বলতাম।'

দুজনেই চুপ করে গেল। নিঃশব্দে হেঁটে এলো ঝাউগাছের অন্ধকার পর্যন্ত।

গাড়ির দরজা খুলে একটু দাঁড়াল ইন্দ্র। তারপর সোজাসুজি গার্গীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল বললে টায়ার্ড লাগছে, আজ বলছ ভালো লাগছে না। দেখে বুঝতে পারছি শরীরও ভালো নেই। কী হয়েছে বলো তো?'

ইন্দ্রর প্রশ্নে সহানুভূতি ছাড়াও কিছু ছিল হয়তো, যা মুহূর্তে অবাধ করে দিল গার্গীকে। এই নির্জনতা ও বৃষ্টির মধ্যে ইন্দ্রনাথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে সে বলল, 'ইন্দ্রদা, আপনি বার বার আমার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করেন কেন! যার জিজ্ঞেস করার সে তো করে না!'

হাতে ছাতা থাকলেও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে গার্গী। মুখ ভেসে যাচ্ছে অস্বচ্ছ আলো আর বৃষ্টিতে। ওই চোখে জল খুঁজে পেল না ইন্দ্র। এখন নিজেকেও অসহায় লাগছে।

ক' মুহূর্ত অপেক্ষা করল গার্গী। তারপর বলল, 'আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি যান। আমার কথা আমিই ভাবব।'

আর দাঁড়াল না। ইন্দ্র দেখল, এলোমেলো কিন্তু দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে গার্গী। বৃষ্টিভেজা নির্জন রাস্তা, ততোধিক নির্জন তার হাঁটা। হঠাৎই আড়াল হয়ে গেল গলির বাঁকে।

৪

জীবনযাপনের ধারাবাহিকতায় ছেদ নেই কোনো। বর্ষা গিয়ে পুজোর মরশুম এলো এবং চলে গেল। তেমন জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়তে না পড়তে শীতও শেষ হয়ে আসছে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ থাকলেও নিষিদ্ধ আকাশে ভুলে ঢুকে পড়ার মতো চকিত চক্কর দিয়ে ফিরে যায় বসন্তের হাওয়া। কৈশোর ও যৌবনে একরকমভাবে এই পরিবর্তনটা অনুভব করত গার্গী, বিশেষত যৌবনে, দীপঙ্করের সঙ্গে পরিচয়ের গোড়ার দিকে। এই একত্রিশে এখনো সে পরিপূর্ণ যুবতী, তবু কী যেন হয়ে যায় তার, কী যেন হতে থাকে—রোদ বৃষ্টি হাওয়ায় খুঁজে পায় না কোনো তারতম্য।

জানুয়ারিতে ওপরের গ্রেডে প্রোমোশন পেয়ে প্রায় সাড়ে তিনশো টাকা মাইনে বেড়ে গেল তার। ঘরে ডেকে প্রোমোশনের চিঠিটা তার হাতে দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোমেশ্বর বলল, 'এটাই যেন শেষ না হয়। কমপিউটর বসবে খুব শীগগিরি। অঙ্কে আপনার ব্রেন খুব শার্প, ভাবছি ফার্স্ট লিস্টে আপনাকে রেকমেন্ড করব।'

কথাগুলো অদ্ভুত শোনালো কানে। হাসিও পেল। সোমেশ্বরকে বলতে ইচ্ছে করছিল, তা-ই যদি হবে, তাহলে সব হিসেব এমন গণ্ডগোল হয়ে গেল কেন!

গার্গী নিজেও ভেবে পায় না কেন! জীবন বদলে যাবে, এইভাবেই যাবে—বদলে যাওয়ার স্বয়ংক্রিয়তায় তার অপমান থাকবে, অভিমান থাকবে, কিন্তু ভূমিকা থাকবে না কোনো, সে কি ভেবেছিল কোনোদিন!

ভাবেনি। অনুমানও করতে পারেনি। আর ভাবেনি বলেই ঘটনার গতি স্তব্ধতায় জড়িয়ে ফেলল তাকে।

দূরত্ব বাড়ছিল ক্রমশ। জোর খাটিয়ে আপসে পৌঁছুবার চেষ্টায় গার্গী দেখছিল দীপঙ্করের গা নেই তেমন। ভাড়া-করা একটা আস্তানা আছে

বলে কিছুটা সময় সেখানে কাটানো, প্রায়ই রাতে বাড়ি না ফেরা, ছেলেটা আছে বলে তার সামনে পিতৃ-পরিচয়ের মোড়ক ঝুলিয়ে রাখা এবং গার্গীর প্রশ্নে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে থাকা—এভাবেই চলছিল দীপঙ্কর। সন্ধের অন্ধকার যেমন আস্তে আস্তে শুষে নেয় বিকেলের আলো, তেমনি, গার্গী অনুভব করছিল তার নিজের ভিতরেও কী একটা ম্লান হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। উপমাটা তার, নিজেরই ; নিজেই বুঝতে পারে নতুনত্ব নেই কোনো। যতোই টানাপোড়েনের মধ্যে থাকুক, এতোদিন দীপঙ্কর ছাড়া কিছুই ভাবেনি সে, দু হাতে পিছনে ঠেলেছে অন্য সব ভাবনা। দীর্ঘ দিনের উপেক্ষায় চারপাশের আর সব ভাবনাই ছেড়ে গেছে তাকে, নতুন করে ভাবতে পারে না কিছু।

সুরমা একদিন বেল দিলেন দরজায়। দেবেন, জানত, শুধু দিনক্ষণটিই জানত না গার্গী। ওঁকে যত্ন করে বসালেও আশঙ্কা গেল না।

এ-কথা সে-কথার পরে আসল কথাটা বলে ফেললেন সুরমা।

'তোমরা তো প্রায়ই থাকো না এখানে ! শুধু শুধু এতোগুলো টাকা ভাড়া গুণছ !'

গার্গী চুপ করে থাকল।

'দ্যাখো, আমাদের কাছে লুকিয়ে লাভ কি ! কর্তা গিন্নি যে যার নিজের বাপের বাড়িতেই থাকছ আজকাল। তুমি কখনো আসো, কখনো আসো না, আর উনি— ।' সুরমা থেমে গেলেন আচমকা। কথা গিলে বললেন, 'আমি তোমার অবস্থা বুঝি, মা। কিন্তু কী করবে ! বাড়িটা ছেড়ে দিতে পারো কিনা দ্যাখো।'

রিহার্সাল দেওয়া গলায় কথা বললেন সুরমা। ইচ্ছে করেই দু মাস বাড়িভাড়া ফেলে রেখেছে দীপঙ্কর। সে-কথাটা তুললেন না আর।

সুরমা চলে যাবার পর একার অভ্যাসে ভাবতে বসল গার্গী। দীপঙ্কর চেয়েছিল বলেই এখানে আসা। না হলে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি ছেড়ে যেদিন চলে এসেছিল দীপ্রকে নিয়ে, সেদিন তো ভেবেইছিল, যদি দীপঙ্কর তাকে বুঝতে না পারে, জোর করে ফিরে যেতে, তাহলে যতোদিন পারে বাবা মা-র কাছেই পড়ে থাকবে মুখ গুঁজে। দীপঙ্কর তখন অন্যরকম ছিল

বলেই আরও এগিয়ে ভাবেনি। ভাবতেও হয়নি। আলাদা বাড়ি নিয়ে দীপঙ্কর বুঝিয়ে দিয়েছিল গার্গীকেই তার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন কি আছে আর! তাহলে বাড়িটা রেখেই বা লাভ কি!

এসব ভেবে দীপঙ্করের জন্যে ছোট্ট একটা চিঠি লিখে রাখল সে। সম্বোধন ও স্বাক্ষর ছাড়া লেখা সেই চিঠিতে সুরমা যে বাড়ি ছেড়ে দেবার কথা বলেছেন সে-কথাও লিখল।

দিন তিনেক পরে অফিসে ফোন করল দীপঙ্কর। গার্গী 'হ্যালো' বলবার পর ভেসে এলো ওর নিরুত্তাপ গলা।

'আমি বলছি—'

'হুঁ।'

'চিঠিটা পেলাম। আমার মনে হয় মিসেস নন্দী ঠিকই বলেছেন। বাড়ি ছেড়ে দেওয়াই উচিত। তুমি কী বলো?'

'আমি কী বলব!' গার্গী কাঠ হয়ে গেল, 'বাড়ি আমি নিইনি। রাখলে রাখবে, ছাড়লে ছাড়বে।'

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থাকল দীপঙ্কর। তারপর বলল, 'তাহলে ভ্যাকেট করে দেওয়াই ভালো। আমি বাড়িঅলার সঙ্গে কথা বলব। তুমি তোমার আর দীপ্রর যা আছে নিয়ে এসো—বাকি সবই তো ভাড়া করা—'

হ্যাঁ, না, কিছুই বলল না গার্গী। রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে শুধু ভাবল, সে শক্তই থেকেছে। দীপঙ্কর হয়তো অপেক্ষায় ছিল, অজুহাত পাচ্ছিল না। সুযোগটা করে দিল।

মাসখানেক পরে একদিন বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ফরমান পেয়ে গেল গার্গী। বিচ্ছেদ চেয়ে কোর্টে আবেদন করেছে দীপঙ্কর। কারণ স্বচ্ছ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-সম্পর্ক থাকা উচিত তা আর নেই তাদের মধ্যে। বেপরোয়া ও অবিন্যস্ত হয়ে উঠে গার্গী তাকে এমনই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলেছে যা তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তার তরফে নানাভাবে আপস করার চেষ্টায় কাজ হয়নি। এর পিছনে রয়েছে তার তথাকথিত স্ত্রীর বাপ-মা এবং আরও একজন পুরুষের প্ররোচনা, যার সঙ্গে গার্গীর সম্পর্ক আর যা-ই হোক, বৈধ নয়। এই অবস্থায় বিচ্ছেদ প্রার্থনা

করা ছাড়া তার আর উপায় নেই।

আইনের ভাষা। খুঁটিয়ে পড়ল সে। পড়তে পড়তেই একটা কাঠিন্য এসে গেল শরীরে। চোখে সামান্য জ্বালা, শরীরে সামান্য আলোড়ন ছাড়া নতুন কোনো বোধে আক্রান্ত হলো না। সাত বছরের বিবাহিত জীবন তাকে যতো না দিয়েছে, নিয়েছে তার চেয়ে বেশি। নতুন আর কী নেবে! মনে পড়ল তমসার কথা; দাদা নিজেরটা নিজেই বুঝে নেবে, একদিন বলেছিল ও। বুঝেই নিল। জীবন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্যভাবে পাল্টে যায় কথারও অর্থ! এর পরেও হয়তো তমসা আসবে। জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে।

একার জীবনে অভাব হয় না সময়ের। গার্গী এখন অনেকটা সময় কাটাতে পারে দীপ্রর সঙ্গে।

তবু, বুঝতে পারে সাত বছরের অভ্যস্ত জীবনের সংস্পর্শ ঘুরছে তার সঙ্গে সঙ্গে। এখনকার অপমান ও অসহায়তার বোধ থেকে কিছুতেই পৌঁছুতে পারে না সেই অনুভবে যা তাকে বুঝিয়ে দেয় সত্যিই সে এমন কিছু করেছিল যা এইভাবে ভেঙে দিতে পারে সম্পর্কটাকে। এটুকু বুঝতে পারে, তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেবার পরই অভিযোগগুলো সাজিয়েছে দীপঙ্কর, হয়তো উকিলের পরামর্শে। কিন্তু, সিদ্ধান্তটা তো ওরই! কেন এমন সিদ্ধান্ত নিল দীপঙ্কর! সুখে অভ্যস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের পায়ে নিজের মতো করে দাঁড়ানোর ক্লেশ সহ্য করতে না পেরে! নাকি স্ত্রীর মান রাখতে গিয়ে বড্ড বেশি দাম দিতে হচ্ছিল তাকে! গার্গী কি পুরনো হয়ে গিয়েছিল তার কাছে! নাকি এসব কিছুই নয়, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিকতার মধ্যে কোনোদিনই সেই জোরটা খুঁজে পায়নি দীপঙ্কর, যা টিকিয়ে রাখে সম্পর্ক! তাহলে কি দীপঙ্করকে ঠিকঠাক চিনতে পারেনি সে, সম্পর্কের ভিতরের মোহটাকেই সত্য ভেবে আঁকড়ে ধরেছিল এতোদিন!

হয়তো। তার পরের ভাবনাগুলোয় অস্বস্তি বেড়ে ওঠে আরও। ক্লিন্ন লাগে নিজেকে, নিজের শরীরটাকে। এ কেমন বিভ্রম! তাহলে কি দীপ্রও শুধুই মোহ!

না। তা হবে কেন! এলোমেলো নিঃশ্বাস ও অন্যমনস্কতার ভিতর

থেকে ক্রমশ নিজেকে ফিরে পেতে পেতে গার্গী ভাবে, তার সত্য, তার অনুভব, তার আকাঙ্খা একান্তভাবেই তার নিজের ; সেখানে ভুল নেই কোনো। দীপঙ্কর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সিদ্ধান্তও সে নিজেই নেবে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। দীপঙ্কর নিজের মতো বাঁচতে চায় বাঁচুক, সে বাধা দেবে কেন ! নিজেকে আর দীপ্রকে নিয়ে তার যে-জীবন সেটা সে নিজেই সাজিয়ে নিতে পারবে।

সংকল্প চিনলেও অপমান যায় না। সংকল্পের জোরেই আরও একটু শুকিয়ে যায় সে। চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকতে।

পার্ক সার্কাসের বাড়ি থেকে একদিন সকালে জোর করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। বিকেলে রিপোর্ট পেয়ে বলল, 'আগে আমার কথা গ্রাহ্য করোনি তো ? এখন বুঝছ কোথায় টেনে এনেছ নিজেকে !'

ইন্দ্রর উদ্বেগে ভান নেই কোনো। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া চিনতে চিনতে উদাসীন হয়ে গেল গার্গী। বলল, 'রোগটা চলে গেছে, ইন্দ্রদা। রোগের জেরটাই ধরা পড়েছে রিপোর্টে। আমি একদমই ভাবছি না।'

'নিজেকে ঠকিয়ে লাভ কী, গার্গী ?'

'ঠকাবো কেন ! যা সত্যি তা-ই বললাম।' ওকে আর বিব্রত করতে চাইল না গার্গী। সহজ গলায় বলল, 'ওষুধ খাই। সেরে যাবে নিশ্চয়ই। আপনি ভাববেন না।'

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে ইন্দ্র বলল, 'কিছুদিন নার্সিং হোমে থাকো না ?'

'আমি !'

'হ্যাঁ।' ইন্দ্র জোর দিয়ে বলল, 'এতে অবাক হবার কী আছে ! শরীরটা তোমার, এর ভালোমন্দ তোমাকেই ভাবতে হবে—'

গার্গীর গলায় ঠাট্টা এসে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না। খানিক ঘাড় তুলে মুখ ভাসিয়ে রাখল হাওয়ায়। তারপর বলল, 'এর চেয়ে যদি বলতেন কোনো মানসিক হাসপাতালে যেতে— অশোকাদির

মতো—'

চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরের কম্পন এড়াতে পারল না গার্গী। সে নিজেও জানে না ঠিক কী বলতে চেয়েছিল। শুধু অনুভব করল, একটা আবেগ আসছে, ঠিক কেন বুঝতে পারছে না। গলার কাছে এসে ছটফট করছে নিঃশ্বাস।

অনেকদিন পরে আজ ব্যস্ততা চলে গেছে ইন্দ্রর সময় থেকে। কাজ নেই, যাবার তাড়া নেই, ফেরারও না। কিংবা এতোই বিচলিত যে গুলিয়ে ফেলেছে সব। রাস্তাও। গাড়ি নিয়ে তাই যত্রতত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে বেরুবার রাস্তা।

ওইভাবেই ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে রেড রোডে পৌঁছে বলল, 'গার্গী, হতাশ হয়ে, ভেঙে পড়ে লাভ কি! জীবনে সবই কি ঠিকঠাক চলে! সবাই সব কিছু পায় না—।' ইন্দ্র হঠাৎই থেমে গেল। আরও কিছুটা রাস্তা নিঃশব্দে এগিয়ে বলল, 'এসব কথা কাউকে বলতে ভালোও লাগে না। সিনেমার ডায়লগের মতো শোনায়!'

পাশে তাকিয়ে ইন্দ্রকেই দেখল গার্গী। ইন্দ্র কী বলতে চেয়েছিল তাকে, কেনই বা থেমে গেল, এখন তার কাছে সবই অস্পষ্ট। একই অস্পষ্টতা নিজের মনেও। বহুদিনের পরিচিত, কিন্তু আজও সে জানে না এই মানুষটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী! মাঝে মাঝে প্রশ্ন জেগেছে মনে, প্রশ্ন থেকেই জেগেছে আরও একটু এগিয়ে যাবার ইচ্ছাও। দ্বিধাই এগোতে দেয়নি। পরে ভেবেছে, সে যেভাবে ভাবে, ইন্দ্রও কি সেইভাবে ভাবে তার সম্পর্কে? উত্তর পায়নি।

আজও উত্তর খুঁজল না গার্গী। শুধু নিজের পাশে ওর উপস্থিতি অনুভব করতে করতে ভাবল, জীবন হয়তো ঠিকঠাক চলে না। কিন্তু. ইন্দ্র ভেঙে না পড়লে আমিই বা ভাঙব কেন!

এর কিছুদিন পরে এক ছুটির বিকেলে দীপ্রকে নিয়ে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কাছে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রাস্তা পার হবার অপেক্ষা করছিল গার্গী। দুদিক থেকেই ছুটোছুটি করছে গাড়ি। ট্রাফিকের সিগন্যাল পেয়ে গাড়িগুলো থেমে যাবার পর জেব্রা ক্রশিং ধরে রাস্তা পেরোতে গিয়ে

আচমকা থমকে দাঁড়াল সে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল দীপ্রর কব্জিটা।

থেমে যাওয়া গাড়িগুলোর মধ্যে নীল অ্যামবাসাডরটাকে চিনতে ভুল হলো না। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে দীপঙ্কর। একা নয়। পাশে যতোটা দূরত্ব না রাখলেই নয় সেটুকু রেখে শান্তা। সুরমার দেওয়া একদিনের বর্ণনা থেকে এতোদিনে আস্তে আস্তে চিনে নিয়েছে সে।

দীপঙ্করই দেখছিল তাকে। চোখাচোখি হতে মুখ ফিরিয়ে নিল গার্গী।

দীপ্র ঠেলা দিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে পড়লে কেন, মা! এখন তো আমরাই যাবো!'

দীপ্রর দৃষ্টি অতো দূর নাগাল পায়নি। ওর কথাগুলোও এতোই সহজ যে অর্থ করারও কোনো মানে হয় না। তবু, অর্থটা এড়াতে পারল না গার্গী।

সামনে চোখ রেখে ছেলের হাত ধরে এগিয়ে যাবার আগে সে বলল, 'হ্যাঁ। চলো—'

